গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৮ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা ২১ - ২৭ জুলাই, ২০০৬ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

বিস্ফোরণ ঃ কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি

মুম্বইয়ে পর পর ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণ ও শ্রীনগরে পর্যটকদের উপর কাপুরুষোচিত আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে ও অপরাধীদের অবিলম্বে খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে এস ইউ সি আই-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ১২ জুলাই এক বিবৃতিতে ১১ জুলাই মুম্বই শহরে পর পর ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণ, যার আঘাতে কয়েক শত মানুষ নিহত ও আহত হয়েছেন — তার তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন, মুম্বইয়ের সাধারণ অধিবাসীরা ১৯৯৩ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে এই ধরনের নৃশংস ও বর্বর আক্রমণের সম্মুখীন হচ্ছেন যার ফলে দেশের একটি অন্যতম বৃহৎ শহরের বাসিন্দা হয়েও তাঁরা জীবনের ন্যূনতম নিরাপত্তা থেকেই বঞ্চিত। দেশের নাগরিকদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রশ্নে এই চূড়ান্ত ও অমার্জনীয় ব্যর্থতার জন্য তিনি কেন্দ্র ও মহারাষ্ট্র সরকারকে ধিক্কার জানান।

গতকাল শ্রীনগরে পর্যটকদের উপর যে কাপুরুষোচিত আক্রমণ ঘটেছে, যার ফলে ৬ জন নিরীহ পর্যটক নিহত ও বহু মানুষ আহত হয়েছেন, কমরেড মুখার্জী তারও তীব্র নিন্দা করেছেন। সাধারণ মানুষের উপর এই ধরনের ঘৃণ্য আক্রমণ যারা করছে, সেইসব অপরাধীদের অবিলম্বে খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পাশাপাশি আহত ও নিহতদের পরিবারগুলিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ

আটের পাতায় দেখুন

ভিতরের পাতায়

- কমরেড শিবদাস ঘোষের ভাষণের অংশবিশেষ
- পুলিশ অফিসারকেই ভিজিলেন্সে...
- দারিদ্র্যসীমার সংজ্ঞা নির্ধারণে নির্লজ্জতা
- ডিওয়াইও'র ৪০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে কমরেড মানিক মুখার্জী'র ভাষণ
- কুলতলিতে সিপিএমের সন্ত্রাস অব্যাহত
- জেলায় জেলায় আন্দোলন

'এক বিন্দু রক্ত থাকতে এক ইঞ্চি জমি দেবনা'

উচ্ছেদ রুখতে নিজস্ব সংগঠন গড়লেন রাজ্যের চাষীরা

''এতদিন পর্যন্ত কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদের যে ঘটনা ঘটছিল তা ছিল খানিকটা বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত। কিন্তু বর্তমানে সরকার যেভাবে বেপরোয়া কৃষকদের জমি থেকে উৎখাত করছে তা সর্বব্যাপক, গোটা রাজ্যজুড়ে। সরকার, সরকারি দল, পুলিশ-প্রশাসন এবং পুঁজির মালিকরা সম্মিলিতভাবে কৃষকদের ওপর এই আক্রমণ নামিয়ে আনছে। তাই একে প্রতিরোধ করা বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মধ্যে দিয়ে সম্ভব নয়। চাই আন্দোলনগুলির মধ্যে ঐক্য এবং সংহতি।'' বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের এই কথাগুলিতেই প্রতিফলিত হয়েছে কৃষিজমি থেকে উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলনের মূল সুর। রাজ্যের যে সমস্ত এলাকায় কৃষকদের উচ্ছেদ করা হয়েছে অথবা উচ্ছেদের প্রস্তুতি চলছে, সেই রাজারহাট, ভাঙড়, বারুইপুর, কাটোয়া, ফলতা, উলুবেড়িয়া, বাগদা, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, হলদিয়া, ডানকুনি প্রভৃতি এলাকা থেকে শত শত কৃষক উপস্থিত হয়েছিলেন ১২ জুলাই মৌলালি যুবকেন্দ্রে কৃষিজমি থেকে উচ্ছেদ প্রতিরোধে সারা বাংলা কৃষক-খেতমজুর কনভেনশনে। জমি থেকে উচ্ছেদ প্রতিরোধে এখানেই রাজ্যভিত্তিক নিজস্ব সংগঠন গড়ে তুললেন তাঁরা।

এই কনভেনশন থেকে দাবি তোলা হয়েছে তথাকথিত শিল্পায়নের নামে কৃষিজমি থেকে কৃষক-খেতমজুর উচ্ছেদ বন্ধ করতে হবে। উর্বর কৃষিজমি দখল করে রাজ্যে খাদ্যসঙ্কট ডেকে আনা চলবে না। যাদের ইতিমধ্যে উচ্ছেদ করা হয়েছে তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। বন্ধ কারখানার জমিতে, সরকারি দখলে থাকা অকৃষি জমিতে, বিভিন্ন জেলার অনুর্বর পতিত জমিতে শ্রমনিবিড় শিল্পগঠন করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজিকে ঢুকতে দেওয়া চলবে না। চুক্তিচাষ চালু করা চলবে না। সেচের জন্য কৃষককে বছরে একর প্রতি ৩০০ লিটার করমুক্ত ডিজেল দিতে হবে।

সরকারি হিসাব অনুযায়ী এ পর্যন্ত রাজ্যে চার লক্ষ একর কৃষিজমি থেকে কৃষক উচ্ছেদ হয়েছে। আরও লক্ষাধিক একর জমি থেকে উচ্ছেদের পরিকল্পনা চলছে। এবং এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে। পাশাপাশি এই উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সর্বত্রই চলছে আন্দোলনের প্রস্তুতি। এই আন্দোলন ও সংগ্রামের অভিজ্ঞতার কথাই উপস্থিত প্রতিনিধিরা কনভেনশনে তুলে ধরেছেন। রাজ্যব্যাপী কৃষিজমি থেকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনগুলিকে সংগঠিতভাবে পরিচালনার জন্য কনভেনশন থেকে গঠিত হয় 'সারা বাংলা কৃষক ও খেতমজুর সংগ্রাম কমিটি'। কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন কৃষক আন্দোলনের দুই সংগ্রামী নেতা কমরেড সেখ খোদাবক্স এবং কমরেড শঙ্কর ঘোষ।

কনভেনশনে উত্তরবঙ্গের কৃষক নেতা, প্রাক্তন সাংসদ দেবেন বর্মণ বলেন, কোচবিহারের নীলকুঠিতে শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ বহু আগে

ছয়ের পাতায় দেখুন

শ্রীনগর ও মুম্বই বিস্ফোরণ

দেশ ও জনগণের স্বার্থে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হোক

কাশ্মীরে ট্যুরিস্ট বাসে এবং মুম্বইতে শহরতলির রেলগাড়িতে পরপর বিস্ফোরণ এবং শত শত যাত্রীর হতাহতের ঘটনা আবারও প্রমাণ করেছে নাগরিক জীবনে নিরাপত্তা রক্ষায় সরকার ও প্রশাসনের অযোগ্যতা ও অবহেলা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে। দেখা যাচ্ছে, বিশ্বসন্ত্রাসবাদের শিরোমণি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভারত সরকারের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশের অভ্যন্তরে এ ধরনের ঘটনার সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ জিনিস প্রমাণ করে, দেশিবিদেশি একচেটিয়া মালিকগোষ্ঠীর স্বার্থে গৃহীত ভারত সরকারের বিদেশনীতি জনস্বার্থের পক্ষে কতটা মারাত্মক। আরও লক্ষণীয় হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার বরাবর এ ধরনের ঘটনায় চোখবুজে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সুরে সুর মিলিয়ে ইসলামিক উগ্রপন্থী সংগঠন, দাউদ কোম্পানি ও পাকিস্তানকে দায়ী করে এবং সন্দেহভাজন কিছু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে সব দায়িত্ব শেষ করে। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। প্রশ্ন হল, যে কেন্দ্রীয় সরকার জনগণের টাকায় তৈরি তহবিলের কোটি কোটি টাকা খরচ করে জনস্বার্থ ও দেশরক্ষার নামে বিশাল গোয়েন্দা দপ্তর পুষছে, সেই সরকার যেকোন জঙ্গি হামলার পরে চোখবুঁজে উগ্রপন্থী সংগঠন বা পাকিস্তানের উপর এককথায় সব দায় চাপিয়ে দায়িত্ব শেষ করতে পারে কি?

এবারের ঘটনার পর, বিশেষভাবে লক্ষণীয়, মন্ত্রীসভায় সব মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর সুরে সুর মেলাননি। এখবরও সংবাদপত্রে এসেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেছেন, এই ঘটনা যে হিন্দুত্ববাদীরা ঘটায় নি তা বলা যায় না। প্রসঙ্গত তিনি বলেছেন, আদবানির ওপর হামলা যে আর এস এস ঘটিয়েছিল, এমন কথা তাঁকে একজন বিচারপতি বলেছেন। অর্জুন সিংকে সমর্থন করেছেন অপর এক মন্ত্রী আন্তুলে। (দ্রঃ আনন্দবাজার ১৫-৭-০৭) আশ্চর্যের বিষয়, তথ্য জানবার গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে যখন দেশজোড়া আওয়াজ উঠছে, তখনই দেখা যাচ্ছে মন্ত্রীসভায় এই ব্যতিক্রমী কণ্ঠ জনগণের কাছে পুরোপুরি চেপে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। অর্জুন সিং-এর বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী অসন্তুষ্ট হয়েছেন বলেও সংবাদ এসেছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর অসন্তোষ প্রকাশের দ্বারাই অর্জুন সিংয়ের বক্তব্য ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয় না। বরং মুম্বই বিস্ফোরণের পরদিন সুরাটের আধনা মসজিদের ওপর বিশ্বহিন্দু পরিষদের হামলা এবং সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাধানোর চেষ্টা এবং ''সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী'' প্রচারের জন্য কুখ্যাত নরেন্দ্র মোদীকে মুম্বই পাঠানোর সিদ্ধান্ত এই প্রশ্নকে সামনে না এনে পারেনা যে, বিগত লোকসভা নির্বাচনে পরাজয় ও দলীয় কোন্দলে ছিন্নভিন্ন হিন্দুত্ববাদীরা পুনরায় পায়ের নিচে মাটি ফিরে পেতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ উস্কে তোলার জন্য এমন কাণ্ড ঘটায়নি। ইতিমধ্যে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিং ও মদনলাল খুরানা বলেছেন — দাউদ ইব্রাহিমের সঙ্গে বাজপেয়ী ও আদবানীর যোগাযোগ আছে। এই অভিযোগের ইঙ্গিত অস্পষ্ট নয়।

এ যাবৎ সর্বদাই দেখা গিয়েছে, লস্কর-ই-তৈবা বা জৈস-এ-মহম্মদের মতো সংগঠন সরকারি দপ্তর, পুলিশ, সামরিক চৌকি বা দূতাবাসের উপর হামলা করেছে। অর্থাৎ সরকারি ও প্রশাসনিক-সামরিক কেন্দ্রই মূলতঃ তাদের স্বাভাবিক লক্ষ্যবস্তু,

ছয়ের পাতায় দেখুন

৫ই আগস্ট সর্বহারার মহান নেতা

কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণদিবসে সমাবেশ

রানি রাসমণি রোড ● বিকাল ৪টা

প্রধানবক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ

সভাপতি ঃ কমরেড মানিক মুখার্জী

১ - ৩ আগস্ট

কোটেশন একজিবিশন

প্রজ্ঞানানন্দ ভবন

(মৌলালি মোড়)

সকাল ১০টা - রাত্রি ৮টা

কুলতলিতে সিপিএমের সন্ত্রাস অব্যাহত

বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয় নিশ্চিত জেনে ২৮ এপ্রিল নির্বাচনের পরের দিনই সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বেলেদুর্গানগর অঞ্চলের পূর্ব-রঘুনাথপুর গ্রামে এস ইউ সি আই-এর তিন কর্মী কমরেডস্ কাদের সেখ, কাদের গাজী ও জাফর মণ্ডলকে আচমকা আক্রমণ করে গুলিবিদ্ধ করে। পরে এই সিপিএম সমাজবিরোধীরা সন্ত্রাস চালিয়ে বহু মানুষকে ঘরছাড়াও করে। শত শত মানুষ পুলিশ-প্রশাসনের কাছে সমাজবিরোধীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবি করে এলাকায় ঘরছাড়াদের ঘরে ফেরানোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং এলাকাকে সন্ত্রাসমুক্ত করার দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তারা নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে ঘরছাড়াদের ঘরে ফেরানোর ব্যবস্থা করেন ও সমাজবিরোধীদের গ্রেপ্তারের আশ্বাস দেন। আবার নতুন হামলা শুরু হয় ২০ জুন। পূর্ব রঘুনাথপুরের দিঘীরপাড়ে এস ইউ সি আই কর্মী ফকির শেখের বাড়িতে সিপিএম আশ্রিত সমাজবিরোধীরা হামলা চালায়। বাড়িতে ভাঙচুর করে, মহিলাদের মারধর করে, যথেচ্ছ পরিমাণে বোমাবাজি করে। ২২ জুন খোলাখালি হাটে এস ইউ সি আই কর্মী গণি গাজীর উপর সিপিএম দুষ্কৃতীরা হামলা চালায়। দলমত নির্বিশেষে মানুষ প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করলে ঐ দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। ঐ দিন রাতে আবার ফকির শেখের বাড়িতে তারা হামলা চালায়, একজন এস ইউ সি আই সমর্থকের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এস ইউ সি আই সমর্থক সহ সাধারণ মানুষ এর বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত হলে পুলিশের কাছে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানায়।

এর দু'দিন পর ২৪ জুন দুপুরে বেলেদুর্গানগর অঞ্চলের উপপ্রধানের বাড়িতে সিপিএম দুষ্কৃতীরা হামলা চালানোর চেষ্টা করে। শত শত মানুষ প্রতিরোধ করলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। ঐ দিনই দুপুরে ১২টা নাগাদ এস ইউ সি আই কর্মী আহাদ শেখের উপর তারা গুলি চালায়। ঘটনাচক্রে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ইতিমধ্যে পুলিশের ভ্রাম্যমান গাড়ি এসে যায়। পুলিশ সশস্ত্র সিপিএম সমাজবিরোধীদের তাড়া করায় সমাজবিরোধীরা অস্ত্র ফেলে মাঠ দিয়ে পালিয়ে যায়। এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শত শত মানুষ মাদ্রাসা মোড়, শেখ পাড়া, কলতলা মোড়গুলিতে জামতলা রোড অবরোধ করে। খবর পেয়ে নেতারা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। জয়নগর থানার ওসি এবং বারুইপুর থানার সিআই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে তাদের ঘেরাও করে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ চলতে থাকে। ও সি এবং সি আই দোষীদের গ্রেপ্তার ও এলাকাকে সন্ত্রাসমুক্ত করার আশ্বাস দেন। ২৮ জুন পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে জয়নগর থানায় এস ইউ সি আই, সিপিএম, ওসি, সিআই, বারুইপুরের এসডিও এবং জয়নগর ২নং ব্লকের বিডিও-র উপস্থিতিতে এক বৈঠক হয়। বৈঠকে এস ইউ সি আই দলের পক্ষে জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রূপম চৌধুরী ও অপর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং কুলতলির বিধায়ক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার, বেলে অঞ্চলের নেতা কমরেডস্ জামির লস্কর, কবিতা সরদার, সত্যেন হালদার, আমীর মণ্ডল এবং সিপিএম-এর উপর্যুপরি হামলায় আক্রান্ত ঘরছাড়া মানুষরা উপস্থিত ছিলেন। এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে তাদের ওপর ধারাবাহিক হামলা এবং সন্ত্রাসের অবসান, এলাকায় শান্তিস্থাপন এবং পুলিশকে নিরপেক্ষ থেকে দোষীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবি করা হয়। এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে এলাকায় শান্তি স্থাপনের জন্য উভয় দলকে নিয়ে একটি 'শান্তি কমিটি' গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। উপস্থিত সিপিএম নেতৃত্ব সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন — যদিও সিপিএম সমর্থক কিছু গ্রামীণ মানুষ এই প্রস্তাবের সাথে সহমত পোষণ করেন।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন ঘটনায় পুলিশ সিপিএম-এর মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে এস ইউ সি আই দলের ৪ জনকে গ্রেপ্তার এবং প্রায় ২৫ জনের নামে কেস করেছে। কিন্তু সিপিএম-হামলাকারীদের নামে ডায়েরি ও কেস করা সত্ত্বেও তাদের কাউকেই গ্রেপ্তার করা হয়নি। তারা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, রাতের অন্ধকারে বোমা-বন্দুক নিয়ে হুমকি দিচ্ছে। গত ৫ জুলাই সন্ধ্যায় নতুন করে এই অঞ্চলের পশ্চিম রূপনগর গ্রামে এস ইউ সি আই প্রভাবিত মোল্লাপাড়ায় হামলা চালায় সিপিএম দুষ্কৃতীরা। পুলিশ খবর পেয়ে এলাকায় যায়। সিপিএম-হামলাকারীদের গ্রেপ্তার না করে তারা দুই এস ইউ সি আই সমর্থককে গ্রেপ্তার করে। সিপিএমের এই পরিকল্পিত ধারাবাহিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ সোচ্চার হচ্ছেন এবং গ্রামে গ্রামে 'গণকমিটি' গড়ে উঠছে। সিপিএম-এর শান্তিপ্রিয় কর্মী-সমর্থকরাও সিপিএম ত্যাগ করে এস ইউ সি আই-এর সাথে জোট বাঁধছেন।

জমি কাড়লে আগুন জ্বলবে

এসডিও-কে জানালেন খড়্গপুরের চাষীরা

খড়্গপুর গ্রামীণ এলাকার বহু মানুষেরই দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন সংস্থানের একমাত্র অবলম্বন এক ফালি জমি। শিল্পায়নের জিগির তুলে সেই জমিকেই কেড়ে নিতে চলেছে রাজ্যের সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি খড়্গপুর গ্রামীণ থানার কলাইকুণ্ডা গ্রামপঞ্চায়েতের অধীন ১৩টি মৌজা ও বোম্বে রোডের দু'দিকে দেশণ্ডা, রূপনারায়ণপুর, য-ফলা, রুইসুণ্ডা প্রভৃতি এলাকার বহু পরিবার।

জমি হারাবার আশঙ্কায় দিন কাটছে পাশাপাশি গ্রামের মানুষদেরও। সরাসরি জমির দালালের ভূমিকায় নেমেছে সিপিএম নেতারা। কোথাও ধমক, কোথাও চমক, কোথাও বা চাকরির প্রলোভন, হাজারো কৌশলে কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদ করতে বদ্ধপরিকর তারা। সরকারি তরফে বাজার দরের চেয়ে ৩০ শতাংশ বেশি দাম দেওয়া হবে বলে দাবি করা হলেও সিপিএম নেতারা কার্যত বাজার দরের ৩০ শতাংশ দামে বিক্রি করতে কৃষকদের বাধ্য করছে বলে অভিযোগ উঠছে। খবরে প্রকাশ, কলাইকুণ্ডা এলাকায় এক একর জমির দাম ১৩ লক্ষ টাকা হলেও কৃষকদের সেই জমি ৩ লক্ষ টাকায় বিক্রি করতে বাধ্য করা হচ্ছে। এদিকে এইসব জমিতে কী শিল্প হবে, কতজন কাজ পাবে, জমিহারাদেরই বা কী ব্যবস্থা হবে — এসবের কোন উত্তর নেই। যেমন উত্তর নেই ফলতার কৃষকদের দুর্দশার কারণ সম্বন্ধে।

এই সর্বনাশা চক্রান্তের প্রতিবাদে এস ইউ সি আই খড়্গপুর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে কমরেড ডি. জগন্নাথের নেতৃত্বে গত ৩ জুলাই খড়্গপুর এসডিও দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। জোর করে কম দামে কৃষকদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নেওয়া থেকে বিরত না হলে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠবে বলে নেতৃত্বের পক্ষ থেকে কড়া হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

ইউক্রেনে মার্কিন সৈন্যদের সামরিক মহড়ার প্রস্তুতি বানচাল

প্রায় দু'শো জন মার্কিনী অতিরিক্ত সেনা এসেছিল ইউক্রেনে সামরিক মহড়ার আগে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সেরে নিতে। কিন্তু দেশের মাটিতে মার্কিন সৈন্যদের উপস্থিতি এবং এই পথে সেদেশে মার্কিন নেতৃত্বে পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোট ন্যাটোর সামরিক অনুপ্রবেশের সূচনা দেখেই প্রতিবাদের ঝড় উঠে যায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকার পূর্বোকার সিদ্ধান্ত বাতিল করে ঘোষণা করে যে ইউক্রেন ন্যাটোয় যোগ দেবে না।

কিন্তু ইতিমধ্যে কৃষ্ণসাগরের ফিওদোসিয়া পোর্টে সেনা ও অফিসারদের নিয়ে মার্কিন রণতরী নোঙর ফেলেছে। অতএব জনমত সরকারের এটুকু ঘোষণায় শান্ত হল না। বিক্ষোভ বাড়তে থাকল। ফিওদোসিয়ায় মার্কিনী অতিরিক্ত বাহিনীর ক্যাম্পের সামনে প্রায় দু'হাজার মানুষ ন্যাটো বিরোধী বিক্ষোভের ঝড় তুলে দিল। প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়ে, ১২ জুন, ২০০৬ মহড়ার প্রস্তুতি স্থগিত রেখে ইউক্রেন ছাড়তে বাধ্য হয়েছে মার্কিন রণতরী (সূত্র ঃ এডিসিও দেমোক্রিত্, জুন, ২০০৬)।

না, সিপিএম-সিপিআইদের কায়দায় কলাইকুন্ডা স্টাইলে প্রতিবাদ নয়। এমন নকল প্রতিবাদ ইউক্রেনের মানুষ করেনি যাতে সামরিক কর্তাদের হৃদয় মথিত হয়, তৃপ্ত হয়। না, এমন নাটুকে প্রতিবাদ তারা করেনি। করেছে কার্যকরী প্রতিরোধ, আর তাই পালাতে বাধ্য হয়েছে মার্কিন সেনাদল।

যথাযথ পুরপরিষেবার দাবিতে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে ডেপুটেশন

পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ, বিজ্ঞানসম্মত জলনিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তোলা, প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে জঞ্জাল সাফাই, রাস্তাঘাট সারাই ও রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করার দাবিতে এস ইউ সি আই হাওড়া টাউন কমিটির উদ্যোগে ২৮ জুন হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সামনে অবস্থান ও মেয়রের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এর আগে প্রায় একমাস ধরে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অঞ্চলে পথসভা ও নাগরিকদের কাছ থেকে উপরোক্ত দাবিগুলির সমর্থনে স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। ২৮ জুন কর্পোরেশনের সামনে শতাধিক মানুষ বেলা ১২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত অবস্থানে অংশ নেন। কমরেডস্ কার্তিক শীল, কমল চৌধুরী ও তাপস বেরা পাঁচ হাজারেরও বেশি মানুষের স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র মেয়রের কাছে পেশ করতে তাঁর অফিসে যান। অনেক আগে থেকে চিঠি দিয়ে জানানো সত্ত্বেও মেয়র উপস্থিত ছিলেন না। মেয়রের তরফে দায়িত্ব প্রাপ্ত কমিশনার এই স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। আলোচনার সময় তিনি দাবিগুলির যথার্থতা স্বীকার করে নেন এবং মেয়রের সঙ্গে আলোচনা করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। এদিন হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রিত শরৎ সদনে একটি অশ্লীল নাটক মঞ্চস্থ করার অনুমতি দানের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে এবং তা বন্ধ করার দাবিতে একটি স্মারকলিপিও মেয়রের উদ্দেশে পেশ করা হয়েছে।

কোচবিহার পুরসভায় রিক্সাশ্রমিকদের ডেপুটেশন

রিক্সাশ্রমিকদের নানাভাবে হয়রানি ও ফাইন আদায় বন্ধ করা, নতুন রিক্সা চালকদের লাইসেন্স প্রদান, রিক্সাস্ট্যান্ডের সমস্যা সমাধান, ন্যূনতম ভাড়া ৫ টাকা করা, স্ট্যান্ডগুলিতে ভাড়ার চার্ট ঝোলানো প্রভৃতি দাবিতে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী অনুমোদিত সংগ্রামী রিক্সাশ্রমিক ইউনিয়ন ১৯ জুন কোচবিহার পুরপ্রধানের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে। নেতৃত্ব দেন ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক কমরেড পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল, নারায়ণ দাস, জিতেন বর্মন, আজিমুদ্দিন মিঞা প্রমুখ। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর পক্ষে কমরেড নৃপেন কার্যী রিক্সাশ্রমিকদের সঠিক নীতির ভিত্তিতে লড়াকু সংগঠন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

৭০ জন শ্রমিকের ইউ টি ইউ সি-এল এস-এ যোগদান

বীরভূম জেলার অন্নপূর্ণা স্টোন ইন্ডাস্ট্রিজের ৭০ জন শ্রমিক সিটুর শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী মালিকঘেঁষা কার্যকলাপে বিরক্ত হয়ে সম্প্রতি ইউ টি ইউ সি-এল এস অনুমোদিত বীরভূম পাথর শ্রমিকদের ইউনিয়নের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। গত ২৬ জুন দেওয়ানগঞ্জ প্রাইমারি স্কুলে এ বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমরেড কুদ্দুস আলিকে সভাপতি এবং হেমন্ত বাস্‌কিকে সম্পাদক করে ১৬ জনের কমিটি গঠিত হয়। এরপর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে স্টোন ইন্ডাস্ট্রিজের শ্রমিকগণ মালিককে দাবিদাওয়া সংক্রান্ত চিঠি দেন।

পঞ্চায়েতি দুর্নীতি বন্ধের দাবিতে বীরভূমে ডেপুটেশন

পাইকপাড়া অঞ্চলে স্বজনপোষণ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে ৬ জুলাই ৬ দফা দাবিতে অঞ্চল প্রধানের নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে দুই শতাধিক মানুষ অংশ নিয়েছিলেন। সুজালপুর মৌজায় প্রকৃত ভূমিহীনদের জমি না দিয়ে যাদের জমি দেওয়া হয়েছে তাদের পাট্টা বাতিল করে প্রকৃত ভূমিহীনদের তা প্রদান করা, অবিলম্বে সমস্ত গরিবদের নাম সম্বলিত বিপিএল তালিকা প্রকাশ করা এবং মিড ডে মিলের রান্নার দায়িত্ব স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে দেওয়ার ক্ষেত্রে সিপিআই(এম) দলের দলবাজি বন্ধের দাবি জানানো হয়। এদিনের ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন নলহাটি লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড আব্দুস সালাম, কমরেডস্ আসাধন মাল, শুকুর সেখ, নজরুল সেখ, সিদ্দিক সেখ প্রমুখ।

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় যুবকদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ গড়ে তুলুন

এ আই ডি ওয়াই ও'র ৪০ বর্ষ পূর্তি সভায় কমরেড মানিক মুখার্জী

অল ইন্ডিয়া ডেমোক্র্যাটিক ইয়ুথ অর্গানাইজেশন (এ আই ডি ওয়াই ও)-এর ৪০ বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান গত ২৬ জুন কলকাতার মহাজাতি সদনে এক বিরাট যুব সমাবেশের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়েছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি থেকে শুরু করে দক্ষিণের সুন্দরবন পর্যন্ত রাজ্যের সকল জেলা থেকে কয়েক হাজার যুবক-যুবতী কলকাতার রাজপথে মিছিল করে সমবেত হয়েছিল মহাজাতি সদন হলে। সভার শুরুতেই হল ভর্তি হয়ে যায়, উপস্থিত অনেককে হলের বাইরে ও রাস্তায় দাঁড়িয়ে বক্তব্য শুনতে হয়। 'সকল বেকারের কাজ চাই', 'স্বনিযুক্তি প্রকল্পের নামে যুবকদের প্রতারণা করা চলবে না', 'অন লাইন লটারির জুয়া বন্ধ কর', 'মদের দোকানের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়া চলবে না', 'বেকার যুবকদের পরিচয়পত্র ও বাস-ট্রাম-ট্রেনে কনসেশান দিতে হবে' ইত্যাদি দাবি সংবলিত ব্যানার-ফেস্টুনে সদনপ্রাঙ্গন ভরে যায়। ঐস্থানেই আয়োজিত হয়েছিল একটি প্রদর্শনী। ডি ওয়াই ও'র ৪০ বছরের নানা আন্দোলনের ছবির পাশাপাশি ছিল শরৎচন্দ্র, নেতাজি, নজরুল, ভগৎ সিং, লেনিন, স্ট্যালিন, কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রমুখ মনীষীদের শিক্ষাগুলি যা যুব সমাজের আন্দোলনে আদর্শ ও প্রেরণার সন্ধান দেয়।

সংগঠনের বর্তমান সদস্যরা সংগঠনের পূর্বতন নেতৃবৃন্দ ও সদস্যদের রক্তগোলাপ দিয়ে সম্বর্ধনা জানান। শহীদস্তম্ভে মাল্যদান করে যুব আন্দোলনের শহীদদের স্মরণ করা হয়, নীরবতা পালিত হয়। সংগঠনের সংগ্রামী ইতিহাস তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন পূর্বতন রাজ্য সম্পাদকবৃন্দ — কমরেডস্ গোপাল কাঞ্জিলাল, ভাস্কর গুপ্ত, রূপম চৌধুরী এবং প্রাক্তন সভানেত্রী কমরেড খাদিজা বানু। বর্তমান রাজ্য সম্পাদক কমরেড স্বপন দেবনাথও বক্তব্য রাখেন। সংগঠনের বিহার রাজ্য ইউনিটের পক্ষে কমরেড ইন্দ্রদেব রাই এবং কর্ণাটক রাজ্য কমিটির পক্ষে কমরেড জি শশীকুমার ঐ দুই রাজ্যে ডিওয়াইও কীভাবে যুব আন্দোলন গড়ে তুলছে এবং কিছু দাবি আদায়ে সফল হয়েছে, তার বিবরণ তুলে ধরেন।

সভার প্রধান বক্তা এস ইউ সি আই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী বলেন, সর্বহারার মহান নেতা এযুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে যাঁরা ডিওয়াইও'র নেতৃত্বে থেকে দীর্ঘ ৪০ বছরের নানা সময়ে আন্দোলন পরিচালনা করেছেন, তাঁদের মুখ থেকেই নানা অভিজ্ঞতার কথা আপনারা শুনলেন। কিছু অভিজ্ঞতা মর্মস্পর্শী। আমি বিশ্বাস করি, এইসব অভিজ্ঞতা আপনাদের নিঃসন্দেহে অনুপ্রাণিত করবে।

তিনি বলেন, ১৯৬৪ সালে একটা বিশেষ সময়ে ডিওয়াইও'র জন্ম হয়েছিল। সে বছর ভয়াবহ দাঙ্গা যেভাবে পশ্চিমবঙ্গের মত বামপন্থী আন্দোলনের ঐতিহ্যসম্পন্ন রাজ্যেও কুৎসিত আকার নিল, যুবকরাও যেভাবে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় লিপ্ত হয়ে গেল, তা মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষকে খুবই ভাবিয়েছিল, ব্যথিত করে তুলেছিল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ যাতে সংগঠিতভাবে না দাঁড়াতে পারে, সেজন্য সাম্প্রদায়িকতা-জাতপাতকে কেন্দ্র করে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টির এই দাঙ্গা শোষক পুঁজিপতিশ্রেণীর চক্রান্তেই বারবার ঘটছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ চেয়েছিলেন, এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে দেশের যুবশক্তিকে সংগঠিতভাবে দাঁড় করাতে। এই ভাবনা থেকেই তিনি ডিওয়াইও গঠন করার ডাক দেন এবং কিছু যুবক তাঁর আহ্বানে এগিয়ে এসে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এভাবেই আপনাদের সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়েছিল। তারপর গত ৪০ বছর ধরে বহু আন্দোলনের ক্ষেত্রে আপনাদের সাফল্য আছে। সাথে সাথে বহু সীমাবদ্ধতাও আপনারা নিজেরাই নজর করেছেন, যেগুলো কাটিয়ে উঠে আপনারা অবশ্যই এগোবার চেষ্টা করছেন।

তিনি বলেন, যুবক বলতে আমরা বুঝি যৌবন, যা সৃষ্টির প্রতীক। এই যৌবনের ধর্ম হচ্ছে, যা জীর্ণ, যা প্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, সেগুলি ভেঙে নতুন সৃষ্টির রাস্তা খুলে দেওয়া। কিন্তু এই সৃষ্টি আপনারা করবেন কী করে? যৌবনের যা শক্তি তা যেমন সৃষ্টিও করতে পারে, আবার অনাসৃষ্টিও ঘটাতে পারে। সত্যিকারের সৃষ্টির জন্য চাই জ্ঞান। জ্ঞান ছাড়া, সচেতনতা ছাড়া মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না। এই যে আমরা বলছি, কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শে ডিওয়াইও লড়ছে, একথার মানে কী? এর অর্থ হল, মহান

যুব সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন কমরেড মানিক মুখার্জী

নেতার চিন্তার আলোকে আমরা জ্ঞানের অধিকারী হব, সমাজকে জানব, সমস্যা ও আক্রমণ কোথা থেকে আসছে তা বুঝব। এই জ্ঞান যদি আয়ত্ত না করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা সৃষ্টির যে লক্ষ্য — আরও উন্নত, আরও বিকাশের পথে সমাজকে নিয়ে যাওয়া তা আমরা পারব না। এই জ্ঞান আমরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা যা ভারতের মাটিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূর্তরূপ হিসাবে প্রতিভাত হয়েছে, তার থেকেই একমাত্র পাব। যারা যুব আন্দোলন গড়ে তুলবেন, তাদের বুঝতে হবে, যুবজীবনের যেসব সমস্যার কথা আপনারা তুলেছেন, সেগুলোর কারণ কী? সমস্যার গভীরে গিয়ে আপনাদের তার কারণগুলো জানতে হবে।

আপনাদের মনে রাখতে হবে, যুবকদের যথার্থ আত্মমর্যাদার পথ কমরেড শিবদাস ঘোষই দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সামাজিক মানুষ হিসাবে যে যুবক কেবল নিজের স্বার্থের কথা নিজের সমস্যার কথা না ভেবে সমাজের কথা ভাবে, এই অর্থে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা অনুভব করে এবং সামাজিক শোষণ-জুলুম, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিজেকে জড়ায় সে-ই যথার্থ আত্মমর্যাদাসম্পন্ন যুবক। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্যেই রয়েছে সত্যিকারের মনুষ্যত্বের সন্ধান, এই মনুষ্যত্ববোধই একজন মানুষের যথার্থ আত্মসম্ভ্রমবোধ। এছাড়া আত্মমর্যাদা কথাটার কোন মানে নেই। অন্যায়ের সাথে আপস করব, নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থে কিংবা অভাবে আছি বলে যৌবনের শক্তিকে বিক্রি করে দেব, এটা আত্মমর্যাদা নয়। যারা যুব আন্দোলন গড়ে তুলবেন তাদের দায়িত্ব হবে, যুবকদের এই আত্মমর্যাদার সন্ধান দেওয়া। এজন্য যুব নেতা ও সংগঠকদের কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করে তার ভিত্তিতে উন্নত রুচি-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ নিয়ে যুবকদের মধ্যে যেতে হবে, তাদের যুব আন্দোলনে সামিল করতে হবে।

তিনি বলেন, '৫০ ও '৬০-এর দশকে এই পশ্চিমবঙ্গের যে সংগ্রামী চেহারা ছিল, এখন সেটা অনেকটাই ম্লান। সেদিন যারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কথা, বিপ্লব, সমাজতন্ত্র, কমিউনিজমের কথা বলত, সাধারণ মানুষ তাদের অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করত, ভালোবাসত। সেসময় এই পশ্চিমবাংলা বামপন্থী আন্দোলনের পীঠস্থান ছিল। সেদিন সমস্তরকম অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনগুলিতে যুবকদের বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। হাতে গোনা কয়েকজন বাদ দিলে সেদিন যুবকদের শাসকদলের ভাড়াটে গুণ্ডা হিসাবে, ভোট জালিয়াতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা যায়নি। ব্যাপক যুবসমাজ সেদিন পাড়ায় পাড়ায় জনজীবনের ন্যায্য দাবিগুলো নিয়ে লড়াই করেছে, পুলিশের সাথে ব্যারিকেড ফাইট করেছে। সেদিন তাদের ডাকতে হয়নি, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা এসেছে। সেদিন বামপন্থা এমন একটা প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল এ রাজ্যে, যা দেখে সারা ভারতের মানুষ অনুপ্রাণিত হয়েছিল। কিন্তু আজ দেখুন, শুধু শহরের নয়, গ্রামের চাষী-মজুররাও বামপন্থা, মার্কসবাদ, সমাজতন্ত্র, বিপ্লব এই কথাগুলিতে আর আগের মতো উদ্বেলিত হয় না। কেন হয় না? গত ৩০ বছর ধরে এই রাজ্যে শাসন যারা চালাচ্ছে তারা নিজেদের বামপন্থী বলে, ইদানিং সিপিএম নেতারা যত না বলেন তার চেয়ে বেশি বলে সংবাদমাধ্যম। তারা তো সিপিএমকে মার্কসবাদী, এমনকী স্ট্যালিনপন্থী বলে প্রচার করে। এর মারাত্মক ফল হয়েছে এটাই যে, সিপিএম নেতৃত্বে পরিচালিত এই সরকারের জঘন্য শাসন ও কার্যকলাপকে সাধারণ মানুষ 'মার্কসবাদীদের', 'কমিউনিস্টদের' কাজ বলে মনে করছে। তার থেকেই মার্কসবাদ, সমাজতন্ত্রের প্রতি সাধারণ মানুষের মধ্যেও একটা অনীহা, বীতস্পৃহা, কোথাও বা খানিকটা বিরোধিতা সৃষ্টি করতেও সক্ষম হয়েছে। কারা সক্ষম হয়েছে, এটা আপনাদের বুঝতে হবে। সক্ষম হয়েছে পুঁজিপতিশ্রেণী। পশ্চিমবাংলার গণআন্দোলন নিয়ে পুঁজিপতিশ্রেণীর ভয় ছিল, তাদের চিন্তা ছিল কীভাবে পশ্চিমবাংলার এই সংগ্রামী ঐতিহ্যকে খতম করে দেওয়া যায়। সেজন্যই তারা সিপিএমকে ৩০ বছর ক্ষমতায় রেখেছে, প্রয়োজনে আরও বহু বছর রাখবে। সিপিএমের এই চরিত্র কিন্তু বহু বছর আগেই উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। তিনি বলেছিলেন, বামপন্থার নাম নিয়ে সিপিএমের মত একটা বড় দুষ্টশক্তি যদি কোনদিন সরকারে বসে, তবে এরা ফ্যাসিস্ট শক্তির মতো যুবকদের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, চরিত্র নষ্ট করে দেবে। মিলিয়ে দেখুন, হয়েছেও তাই। ফলে, ডিওয়াইও সংগঠকদের আজ যুবজীবনের নানা সমস্যা নিয়ে লড়াইয়ের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

কমরেড মুখার্জী বলেন, যুব জীবনের সমস্যাগুলির কারণ আপনারা ধরতেই পারবেন না, যদি এই সমাজের শ্রেণীবিভক্তি আপনারা না বোঝেন; পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় শোষণের রূপ, রাষ্ট্রের চরিত্র, রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য কী, এগুলি না বোঝেন। যুবকদের বোঝাতে হবে, মূল সমস্যাটা হচ্ছে পুঁজিবাদী শোষণ। যতদিন পর্যন্ত এই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বিপ্লবের আঘাতে হটিয়ে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা না যাচ্ছে, ততদিন যুবজীবনের মূল সমস্যাগুলো থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। কমরেড শিবদাস ঘোষের এই মূল শিক্ষা ও পথনির্দেশকে যদি যুবকরা ধরতে না পারেন, তাহলে বারবার ভুল পথে আপনাদের শক্তি ব্যয় হবে। মনে করবেন, সিপিএম সমস্যার সমাধান করতে পারছে না, অতএব ভোটে অন্য একটা পার্টিকে জেতানো যাক। আবার, ঐ পার্টির শাসনে যখন দেখবেন সমস্যা বাড়ছে তখন অন্য পার্টির কথা ভাববেন। ধরতেই পারবেন না, এভাবে ভোটের মাধ্যমে সরকার পাল্টে পুঁজিবাদকে হটানো যাবে না। এজন্য বিপ্লব অপরিহার্য। সেই পথে এগোতে হবে। এই আত্মপ্রত্যয় আসবে জ্ঞানের মধ্য দিয়ে, যা পাওয়া যাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার মধ্যে।

তিনি বলেন, নিজেদের অসহায় ভাববার কোনও কারণ নেই। পুঁজিবাদী শোষণ-জুলুম যেমন আছে, সরকারি অত্যাচার-নিপীড়ন আছে, ৩০ বছর ধরে সিপিএমকে সামনে রেখে সংবাদমাধ্যম গণআন্দোলনের বিরুদ্ধে একটানা যে প্রচার চালাচ্ছে, আজ সমাজে সেটাই তো একমাত্র ধারা বা কারেন্ট নয়; কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাকে হাতিয়ার করে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক একটার পর একটা গণআন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে এস ইউ সি আই তো একটা পাল্টা কারেন্ট তৈরি করেছে। সেটা সমাজে আছে — শুধু এই পশ্চিমবঙ্গে নয়, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেই সেটা কাজ করছে, এটাকেই শক্তিশালী করতে হবে।

যুব সংগঠকদের উদ্দেশেও তিনি বলেন, আপনারা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার চর্চা করুন, জানুন, তারপর সেই শিক্ষাকে হাতিয়ার করে যুবকদের মধ্যে যান, তাদের মধ্য থেকেই যুব আন্দোলনের কর্মী সংগ্রহ করুন, লড়াই গড়ে তুলুন। ঐ যুবকরাই ধীরে ধীরে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা বুঝবে, পার্টি বুঝবে, বড় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বে, বিপ্লবের সৈনিক হবে। গ্রামে যুব আন্দোলনের সমস্যা নিয়ে তাদের সমবেত করুন, দায়িত্ব ছেড়ে দিন, যাতে তারা নিজ উদ্যোগে কাজ করে সেদিকে দৃষ্টি রাখুন। ডিওয়াইও'র কর্মী-সংগঠকরা এই পথে এগিয়ে যাবেন, এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে কমরেড মানিক মুখার্জী বক্তব্য শেষ করেন। সভাশেষে ডি ওয়াই ও ঢাকুরিয়া ইউনিটের পক্ষ থেকে মদ ও অনলাইন লটারির উপর একটি নাটক মঞ্চস্থ করা হয়।

শ্রমিকশ্রেণীর দলকে ভালো না বাসলে শ্রেণীতত্ত্বের উপলব্ধি ঘটে না

[আগামী ৫ই আগস্ট, সর্বহারার মহান নেতা, এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের ৩০তম মৃত্যুবার্ষিকী দেশব্যাপী যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও মর্যাদায় পালন করার আহ্বান জানিয়েছে দলের কেন্দ্রীয় কমিটি। তাঁর জীবনসংগ্রাম ও শিক্ষাগুলি উপলব্ধি করে নিজ নিজ বিপ্লবী চরিত্র গড়ে তোলার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করার দ্বারাই মহান নেতার প্রতি আমরা যথার্থ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পারি। এই লক্ষ্য থেকেই বিপ্লবী কর্মীদের আচার-আচরণ সংক্রান্ত তাঁর মূল্যবান কিছু শিক্ষা 'জ্ঞানতত্ত্ব, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও বিপ্লবীজীবন প্রসঙ্গে' পুস্তিকা থেকে আমরা এখানে তুলে ধরলাম। — সম্পাদক, গণদাবী]

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই যেমন প্রেম, ভালোবাসা, যৌনজীবন, বিবাহ এসবের প্রয়োজন আছে, বিপ্লবীদের জীবনও তার ব্যতিক্রম নয়। সাধারণত এই সমস্ত বিষয়কে অনেকেই ব্যক্তিগত বিষয় বলে মনে করেন এবং এসব নিয়ে মাথা ঘামান না। কিন্তু আমি বলতে চাই, জীবনের সমস্ত দিক ব্যাপ্ত করে যে সংগ্রামের শিক্ষা আমাদের দলে প্রতিনিয়ত চর্চা করা হয় সেটা অনুসরণ করে যে সমস্ত নেতারা পার্টির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে (disposal) আছেন, অর্থাৎ পার্টির বাইরে যাঁদের অন্য কিছু নেই, তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের সংগ্রামটা এমনই হবে যে, তাঁদের গোটা জীবনটা সকল পার্টিকর্মীর কাছে স্বচ্ছ কাচের মত অনুভূত হয়। বিপ্লবী বলে, পার্টির নিয়ন্ত্রণে আছেন বলে, তাঁদের জীবনে প্রেম-ভালবাসা-বিবাহ প্রভৃতির দরকার নেই তা নয়। কিন্তু পার্টির নিচুতলার কর্মীরা এবং ব্যাপক জনসাধারণ পার্টির ওপর আস্থা রাখবে কী করে যদি তারা দেখে, এই সমস্ত নেতাদের ব্যক্তিগত জীবন এমন ধরনের যেটা বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়নি। নেতারা ভাল থাকুন, খারাপ থাকুন, গাড়িতে চলুন কি হেঁটেই চলুন, সেটা যাই হোক না কেন, নেতাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিপ্লবী আন্দোলনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি না, জনসাধারণ সেটাই দেখতে চায়। যদি, না হয় সেটা সুন্দরও হয় না, মানুষকে শক্তিশালীও করে না, বরং দুর্বল করে। এরকমভাবে চললে রাজনীতি হয়ে পড়ে একটা প্রফেশন বা পেশার মত। কেউ হয়তো চাকরি করতেন, তার বদলে রাজনীতি করে মোড়লি করছেন। এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হ'লে দল ও কর্মীদের প্রতি মানুষের আবেগ হারায়, কর্মীদের সাধনা হারায়, জ্ঞানবুদ্ধি খর্ব হয়ে যায়। যারা দেশের মানুষকে জাগাবে, সাধারণ মানুষ তাদের ওপর আস্থা স্থাপন করতে চায়। এই আস্থা স্থাপন মানুষ তখনই করতে পারে যখন তারা দেখে, নেতারা শুধু স্লোগান দেন না, জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চাকেও তাঁরা যথার্থ গুরুত্ব দেন, বাহুল্য মনে করেন না। এবং একই সাথে তারা অভিজ্ঞতা থেকে বোঝে, নেতারা জীবনের সমস্ত দিক ব্যাপ্ত করেই সংগ্রাম করছেন। আমাদের মত বিপ্লবী দলের এই দিকটির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতেই হয়। কেননা, অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখেছি, এসব ব্যক্তিগত সম্পর্ক অনেক বড় মানুষকেও কীভাবে দুর্বল করে দেয়। তাই ভারতবর্ষের মত দেশে এ দিকটার প্রতি নজর না রাখলে দলের বিপ্লবী চরিত্র রক্ষা করাই দুরূহ হয়ে পড়তে পারে। ....

শ্রেণী, দল ও বিপ্লবকে না ভালোবাসলে কমিউনিস্ট হওয়া যায় না

এই প্রসঙ্গে বিপ্লবী জীবনে জনগণের প্রতি ভালোবাসা ও পার্টির প্রতি ভালোবাসার প্রশ্নটিও স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে। অনেকে মনে করেন, তিনি যেহেতু জনগণকে ভালোবাসেন, শ্রমিকশ্রেণীকে ভালোবাসেন তার মানেই তিনি একজন বিপ্লবী, একজন কমিউনিস্ট। আমি মনে করি, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা বুর্জোয়া মানবতাবাদীদের মধ্যেও অনেকেই আছেন যাঁরা জনগণকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছেন, মানুষের জন্য আত্মত্যাগ করেছেন, কিন্তু তাঁরা কমিউনিস্ট ছিলেন না, বা হতে পারেননি। যেকোন প্রকৃত কমিউনিস্টেরই জনগণ ও শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি ভালোবাসা না থেকে পারে না। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, এই ভালোবাসা নিছক ভাবাবেগ ছাড়া আর কিছু নয়। যে পার্টি বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে, জনগণ ও শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করবে, সেই পার্টির নেতা ও কর্মীরা যদি জনগণ ও শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি ভালোবাসাকে শ্রমিকশ্রেণীর দলের প্রতি ভালোবাসায় রূপান্তরিত করতে না পারেন, তাহলে তাঁদের মধ্যে কমিউনিস্ট বিপ্লবী চরিত্র গড়ে উঠবে না। কারণ, তাঁদের মনে রাখা দরকার, ভালোবাসার সেই রূপ বিশেষীকৃত হচ্ছে, মূর্ত হচ্ছে, শ্রমিকশ্রেণীর দলের প্রতি ভালোবাসার মধ্য দিয়ে। তাই সেই দলকে যাঁরা ভালোবাসতে পারেন না, ছোটখাট ভুল, ত্রুটি-বিচ্যুতি, তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যক্তিগত কারণ, অথবা তুচ্ছ মতপার্থক্য দেখা দিলেই যাঁরা পার্টির প্রতি মমত্ববোধ হারিয়ে ফেলেন, অতি সহজেই দলকে ধূলায় মিশিয়ে দেন, তাঁরা বিপ্লব বুঝতে পারেননি। যেমন শ্রেণীকে না ভালোবাসলে শ্রেণীতত্ত্ব আয়ত্ত করা যায় না, সেইরকম শ্রমিকশ্রেণীর দলকে ভালো না বাসলে শ্রেণীতত্ত্বের উপলব্ধি ঘটে না। শুধু তর্ক করে, আলাপ-আলোচনা করে এর সন্ধান পাওয়া যায় না। আমি বলব, যাঁরা বিপ্লবের দায়িত্ব বহন করতে চান তাঁদের যেমন মার্কসবাদের নানা বিষয় নিয়ে ক্রমাগত চর্চা করতে হবে, পড়াশুনা-আলাপ-আলোচনা করতে হবে, একইসাথে দলের দায়িত্বও তাঁদের অতি অবশ্য বহন করতে হবে। একটা ক্লাস বা স্কুলে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে মার্কসীয় দর্শন ও বিপ্লবী দল গঠন সংক্রান্ত আমাদের যে ন্যূনতম শিক্ষা তার সবকিছুই আপনারা আয়ত্ত করে ফেলবেন, বিষয়টা এত সহজ নয়। তাই অন্য সমস্ত দলের সাথে বিপ্লবী দলের মূল পার্থক্য কোথায়, আজকের চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল নিকৃষ্ট ব্যক্তিবাদের যুগে একটা শ্রমিকশ্রেণীর দল গঠনের যথার্থ মার্কসবাদ-লেনিনবাদসম্মত পদ্ধতি কী, এরকম বহু বিষয় আপনাদের ভালো করে বুঝতে হবে। বুঝতে হবে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে আমাদের দলের সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ কী এবং ভারতবর্ষের বিশেষ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কাঠামোতে এদেশের বিপ্লবের যথার্থ রণনীতি-রণকৌশল কী হবে। এ সমস্ত কিছুই আপনাদের ভালো করে বুঝতে হবে।

মার্কসবাদ শুধু অর্থনীতি ও রাজনীতির বিশ্লেষণ নয়, মার্কসবাদ হল সামগ্রিক জীবনদর্শন

পার্টিকে ভালোবাসার অর্থ হল, যাঁরা পার্টিকে ভালোবাসেন তাঁরা এর মধ্যে ব্যথা এবং আনন্দ দুটোকেই সমানভাবে ভোগ করেন। বিপ্লবটা যে ভাববিলাসিতা নয় এবং বিপ্লবের জন্য পার্টিকে যে শক্তিশালী করতে হবে, এটা তাঁরা জানেন। যে কর্মীটি পার্টিকে ভালোবাসে সে যে বিপ্লবের জন্য প্রাণ দেয়, তার সেই প্রাণ দেওয়াটা ঘটে পার্টির জন্যই। এই হল তার সত্যিকারের বিপ্লবী হওয়ার অভিব্যক্তি। অর্থাৎ আমি বলতে চাই, শ্রেণীর প্রতি আবেগের বিশেষীকৃত প্রকাশ হচ্ছে দলের প্রতি আবেগ এবং শ্রেণী ও বিপ্লবের প্রতি ভালবাসার বিশেষীকৃত প্রকাশ হচ্ছে পার্টির প্রতি ভালবাসা। এই হচ্ছে মার্কসবাদের একটা মূল কথা। এই সংগ্রামে দায়িত্ব পালন আছে, ঝঞ্ঝাট আছে, কিন্তু সেগুলো সকলেই ব্যক্তিগতভাবে এবং যৌথভাবে আলাপ-আলোচনা করে সমাধান করছে। কেউ একা লড়ছে এমন নয়, সকলের সাথে মিলেমিশে লড়ছে। আলাপ-আলোচনা, মেলামেশা সবকিছুর সাহায্যেই সমাধান করছে। যদি দেখা যায়, কেউ একজন শুধু পড়ছে কিন্তু লড়ছে না, দায়িত্ব বহন করছে না, লড়াই চালাচ্ছে না, তাহলে বুঝতে হবে সে জানা আসলে ভুল জানা। এভাবে জানার বিপদ হচ্ছে এতে যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে না, বরং 'ইগো' বাড়ে এবং বিভ্রান্তি বাড়ে। এ আমাদের পদ্ধতি নয়। মার্কসবাদী পদ্ধতিতে শেখা কথাটার মানে কী ? এই কথার অর্থ, একজন যা শিখল বা সত্য বলে জানল সে জীবনে সর্বক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করছে, অপরকে শেখাচ্ছে। যেমন করে শেখালে অপরে শিখবে তেমন করে শেখাবার চেষ্টা করছে, তেমন করে শেখাবার কায়দা আয়ত্ত করার জন্য লড়ছে। ঘরে-বাইরে, বন্ধুদের সাথে, অফিসে, কাছারিতে, যেখানে যার সাথেই সে মিশুক না কেন সকলেই বুঝতে পারবে, শুধু পার্টি মিটিং বা আলাপ-আলোচনাতেই নয়, এটাই হল তার জীবনবেদ। এই জন্যই মার্কসবাদকে বলা হয় জীবনদর্শন। এটা একটা অর্থনৈতিক তত্ত্ব শুধু নয়। মার্কসবাদ জীবনকে পরিবর্তিত করে এবং গোটা সমাজের উন্নতির জন্য লড়াই করতে শেখায়। দ্বন্দ্বের মধ্যে আনন্দ নিতে শেখায়। দুঃখের মধ্যেও যে কী আনন্দ তা উপভোগ করতে শেখায়। এ জিনিস যে উপলব্ধি করতে পারে না, সে শুধু দুঃখ দেখে ভয়ে পিছিয়ে যায়।

জানা ও উপলব্ধির মধ্যে পার্থক্য বিরাট

এ প্রসঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও বোঝা দরকার। স্মরণশক্তি থাকার ফলে মানুষ অনেক কথা স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারে এবং সেই কথাগুলো আবার শোনাতে পারে। কিন্তু এটা পারে বলেই একথা প্রমাণ হয়ে যায় না, তাঁদের সকলের মধ্যে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে উপলব্ধি খুব গভীর আছে। প্রায়শই দেখা যায়, যাঁরা তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির জোরে অনেক কিছু মনে রাখতে পারেন তাঁদের তত্ত্বের প্রশ্নেই হোক বা অন্য যেকোন ক্ষেত্রেই হোক, আমরা বেশ জ্ঞানীগুণী বলে ধরে নিই। এধরনের বিভ্রান্তি প্রায়ই দেখা যায়। তাই স্মরণশক্তি ও যথার্থ উপলব্ধির মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় বা কতটুকু সেটা সঠিকভাবে বুঝতে হলে দেখতে হবে, যেকথা এই সব ব্যক্তিরা মুখে বলছেন সেই অনুযায়ী তাঁদের রুচি-সংস্কৃতির জায়গাটা উন্নত হচ্ছে কি না। কেননা, এই রুচি-সংস্কৃতির ধাঁচাটা উন্নত না হলে যা আমরা বলছি তা জীবনে যথার্থ প্রয়োগ করছি কি না সেটা বোঝা যাবে না। বাড়িঘর ছেড়ে দিয়ে সর্বক্ষণ পার্টির কাজে যুক্ত থাকলেই তার দ্বারা বোঝা যায় না, জীবনে বিপ্লবী আদর্শের যথার্থ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন্ নেতার অবস্থান কোথায়। আমার এই কথাটা আপনারা মনে রাখবেন। নাহলে দেখুন, স্কুল-কলেজের ছাত্ররা, মাস্টারমশাইরাও তো অনেক কিছু মুখস্থ রাখতে পারেন, অপরকে শেখাতেও পারেন, কিন্তু তাঁদের অনেকের জীবনেই তার কোন প্রভাব নেই। এ হল অনেকটা ভুক্ত বস্তু উগরে দেওয়ার মতো। এজন্যই মার্কসবাদ বলেছে, জানা এবং উপলব্ধির মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য বর্তমান। এই পার্থক্যটা সঠিকভাবে ধরতে পারলেই আপনারা বুঝতে পারবেন, কী সেই কারণ যার জন্য আমরা একজনের ক্ষেত্রে দেখতে পাই, তাঁর মার্কসবাদ নিয়ে প্রচুর পড়াশুনা, ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি এবং মেধাশক্তি (intellectual faculty) থাকা সত্ত্বেও তিনি যখন এসব নিয়ে আলোচনা করেন সে আলোচনায় কোথায় যেন একটা অভাব থেকে যায়। বিষয়টা ঠিক মনের মধ্যে গেঁথে যায় না। অথচ আর একজনের ঐরকম ডিগ্রি না থাকলেও সে যখন কথা বলে সেটা যেন মনের ভেতরে দাগ কেটে যায়। প্রথম স্তরের লোকেরা অনেক সময় অপরের দেওয়া কোনও তথ্যের (reference) ভুল ধরে সেই ভুলটাকেই বড় করে দেখান। কিন্তু তিনি একবারও খেয়াল করেন না, তিনি যে তথ্যটা দিচ্ছেন সেটা সঠিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি তেমন ফল পাচ্ছেন না, যেটা হয়তো একটা ভুল তথ্য দেওয়া সত্ত্বেও আর একজন হাতেনাতে

ভালো ফল পেল। শুরুতে প্রথম স্তরের কমরেডদের এ নিয়ে তেমন সমস্যা হয় না। কিন্তু প্রথম স্তরের কমরেডরা যদি তাদের ভুল সংশোধন করতে না পারেন, এমন একটা সময় আসে যখন তাঁদের মধ্যে অহংবোধ মারাত্মকভাবে দেখা দেয় এবং তাঁরা অহংসর্বস্ব হয়ে যান, নিজেদের মূল্যায়ন করার ক্ষমতাও তখন তাঁদের কমে যায়। নিজেদের অজ্ঞাতেই তাঁদের মনে প্রচুর কাদামাটি জমে যায়।

তাই আমি কমরেডদের বলব, প্রতিমুহূর্তে নিজেকে প্রশ্ন করতে যে, তাঁরা যা বলছেন সেটা সত্যিই বুঝেছেন কি? যদি বুঝে থাকেন, তাহলে জীবনে তার প্রয়োগ হবে, তার ফল দেখতে পাওয়া যাবে। তাই বলছি, পড়া, আলোচনা করা, তর্ক করা এগুলো যখন জীবনকে কেন্দ্র করে যে সর্ব ব্যাপক সংগ্রাম সেই সংগ্রামেরই একটা অংশ হিসাবে আসে তখনই সেটা কাজে লাগে। কেউ যদি নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে সংগ্রাম না করেন, দায়িত্ব পালন না করেন, তাহলে সেই সব আলোচনা, তর্ক বা পড়াশুনার কোন মানে নেই। শুধু পড়ছি, আলোচনা করছি, সন্ধ্যেবেলায় পার্টি অফিস যাচ্ছি, আর পার্টির কাজকর্ম একটু ঢিলেঢালাভাবে যখন যা করার করছি, এই মনোভাব নিয়ে পড়া এবং তর্ক-বিতর্ক যাই করি তাতে আমরা অনেক কথা শিখি বটে, কিন্তু সত্যিকারের জ্ঞান অর্জন কিছুই করি না। আবার বলি, কেউ জ্ঞান অর্জন করেছে মানেই ক্রিয়ার মধ্যে সে অবস্থান করছে। বিষয়টা এমন নয় যে, আমি জ্ঞান অর্জন করছি, তারপর দিনক্ষণ দেখে কবে লড়াই শুরু করব সেটা ভাবছি। বিষয়টা এমন হতে পারে না।

বিপ্লবী জীবনে দুঃখও আনন্দের আর একটা রূপ

আমি যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছি ততটুকু লড়াই করছি। ভুল হলেও লড়ছি। লড়াইয়ের মধ্যেই আমার আনন্দ। সেই লড়াইতে যে দুঃখ সেই দুঃখের মধ্যেও আনন্দ। দুঃখও আনন্দের একটা রূপ হতে পারে। যে লড়তে জানে, যে জ্ঞানী, সে জানে দুঃখ ও আনন্দ মাসতুতো-পিসতুতো ভাই। আনন্দের মধ্যেই দুঃখ, দুঃখের মধ্যেই আনন্দ। আমাদের দেশের একজন মস্ত বড় সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রও একথাটা বলে গেছেন। তিনি বলেছেন, ভয়শূন্য যে দুঃখ তাকে আনন্দের মতোই উপভোগ করা যায়। এখানেও দেখুন, সেই সংগ্রামের, সেই লড়াইয়ের সুর। ভয়শূন্য যে দুঃখ — এই কথাটার মানে হচ্ছে নির্ভীকভাবে কোন একটা কাজ যদি কেউ একটা স্থির সংকল্প নিয়ে করে, একটা মূল্যবোধের জন্য লড়ে, তাহলে তার বেদনাটা শুধু নিছক বেদনা নয়, আনন্দময় একটা রূপ তার আছে। যারা ভীত, সন্ত্রস্ত, দ্বিধাগ্রস্ত তাদের কাছে দুঃখটা হচ্ছে সর্বব্যাপক এবং সর্বাত্মক। দুঃখ তাদের ছেয়ে ফেলে, আনন্দ তারা দেখতে পায় না।

এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যাদের প্রচুর পয়সা আছে, এমন অঢেল পয়সা আছে যে পয়সা কীভাবে খরচ করবে সেটা তারা জানে না, তাদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ভাবেন, এই মানুষগুলোর কত আনন্দ, কেমন সুখে তারা আছে ! তাঁরা মনে করেন, এদের আবার অভাব কীসের ? কিন্তু সাধারণ মানুষ যাই ভাবুন, এমন যারা উচ্চবিত্ত, যাদের টাকাপয়সার কোন অভাব নেই, বাস্তব জীবনে প্রায়ই দেখা যায় তাদের অনেকের মধ্যেই আনন্দ নেই, সুখ নেই। তারা অনেকেই সিজোফ্রেনিয়ায় ভুগছে। প্রচণ্ড মানসিক অশান্তি ভোগ করছে। তারা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু মনে আনন্দ নেই। তারপর গিয়ে কোন সাধুবাবার পায়ে ধরছে যদি আনন্দ কিছু পাওয়া যায়, যদি মোক্ষলাভ হয়। কোন কিছুতেই এদের আনন্দ নেই, কারণ তারা সংগ্রাম থেকে মুখ ফিরিয়েছে। তারা সব পরগাছা। তারা মানব সভ্যতার গ্লানি ও কলঙ্ক। মানুষের সংগ্রামের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। সমাজের সমস্ত সম্পদ চোরের মত আত্মসাৎ করে, মানুষকে ঠকিয়ে তারা নিজেরা উপভোগ করছে। এতেও তারা বাঁচে না। তাদের মন মরে, শিক্ষা মরে, সংস্কৃতি মরে, শান্তি মরে, তারা কোন কিছুতেই শান্তি পায় না।

কিন্তু উল্টোদিকে তাকিয়ে দেখুন। ভিয়েতনামের জঙ্গলে যারা লড়াই করেছে, তাদের রাতে ঘুম ছিল না, যে কোন মুহূর্তে বোমা পড়তে পারে বলে যাদের রাইফেল কাঁধে সারারাত সজাগ থেকে লড়তে হয়েছে, অথবা দুনিয়ার ইতিহাসে যত বিপ্লবী মাঠেঘাটে লড়েছে, তারা কখনও হয়তো ভাল থেকেছে কখনও থাকেনি, তাদের কখনও খাওয়া জুটেছে কখনও জোটেনি। কিন্তু খাওয়া জুটলো কিনা, কোন কিছুর অসুবিধা হল কি না, পান থেকে চুন খসলো কি না, আরামে থাকা হল কি না তা নিয়ে তাদের কোন মানসিক বিকার ছিল না। তাদের জীবনগুলো দেখুন। তারা কেউ সিজোফ্রেনিয়ায় ভোগেনি। তারা ছিল অতলান্ত প্রশান্তির প্রতিমূর্তি। এই যে লোকগুলো তাদের কি দুঃখ-ব্যথা কিছু ছিল না ? হ্যাঁ, ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আনন্দের সাগরে তারা ডুবে ছিল। তার কারণ, দুঃখও তাদের কাছে ছিল আনন্দের একটা রূপ। দুঃখকে তারা আনন্দের মতো উপভোগ করতে জানত।

প্রকৃত জ্ঞান মানুষকে বদলে দেয়

এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় বলে যেতে চাই। পুঁথিগত বিদ্যা আর কিছু তর্ক করার ক্ষমতা, বা কিছু তথ্য দেওয়ার ক্ষমতা থাকলেই তাকে জ্ঞানী বলা যায় না। বিশেষ করে কেউ যদি ইংরেজি জানেন আর তাঁর যদি স্মরণশক্তি ভাল থাকে, পড়াশুনো করার একটা ঝোঁক ও উদ্যোগ থাকে — তাহলেই তিনি অনেক কিছু আওড়াতে পারেন। কিন্তু তার দ্বারা তাঁর মধ্যে সত্যিকারের উপলব্ধি কতটা ঘটেছে তা বোঝা যায় না। আসলে যথার্থ জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্যের মধ্যে পার্থক্য কী, এটা অনেকেই ধরতে পারেন না। পাণ্ডিত্য হচ্ছে অনেকটা বোঝার মতো — এক অর্থে সেটা নিষ্ফলা। কিন্তু জ্ঞান এবং সংগ্রাম পরস্পর ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

অথচ ভাববাদীরা, পুঁজিপতিরা, পরগাছারা যুগে যুগে ভাবকে করে ফেলেছে তাদের বিলাসিতার সামগ্রী, জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন মানসিক বিলাসের একটা উপকরণ। জীবনে তার কোন প্রয়োগ নেই, শুধু আলোচনার জন্য আলোচনা। কিন্তু যে মানুষ এগোতে চায়, যে মানুষ আশাবাদী, যে মানুষের জীবনের প্রতি বিশ্বাস আছে, শ্রদ্ধা আছে, যে মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই করে এগিয়ে যেতে চায়, সে মানুষের এমন জ্ঞান দিয়ে কাজ হবে না। তাই ক্রিয়াহীন যে জ্ঞান সেটা জ্ঞানের নামে কুজ্ঞান। সেটা এক ধরনের ভাঁড়ামি। সে জ্ঞান অনেক সময় মানুষের চিন্তার যে স্বাভাবিক গতি, সাবলীল গতি, চিন্তা করার যে পদ্ধতি তাকেই গুলিয়ে দেয়, মানুষকে অসুস্থ, অপ্রকৃতিস্থ করে। তাই তেমন জ্ঞান যথার্থ অর্থে জ্ঞানই নয়।

সংগ্রামহীন জ্ঞান অলস বিলাসিতা

তাহলে দেখা যাচ্ছে, জ্ঞান বা চিন্তাও একটি ক্রিয়া। যে চিন্তা বা জ্ঞান, ক্রিয়া বা সংগ্রামের সাথে যুক্ত নয়, সেটা অলস বিলাসিতা। অনেক সময় দেখা যায়, একজন লোক মহাপণ্ডিত, কিন্তু চিন্তা সম্পূর্ণ তালগোল পাকানো (completely muddled)। তিনি অনেক পড়াশুনা করেছেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত অধীত বিষয়গুলিকে সংযোজিত (integrate) করতে বা মেলাতে পারেননি, অর্থাৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ (systematise) করে, ভারসাম্য বজায় রেখে (balance করে) বিষয়গুলোকে ধরতে পারেননি। তিনি একসময়ে যা ভাবেন, ঠিক পরের মুহূর্তেই তার ঠিক উল্টোটা ভাবছেন। আমি এ প্রসঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে যেতে চাই। সমস্ত কমরেড বিভিন্ন বিষয় খুব মন দিয়ে পড়ুন, ভাল করে পড়ুন, এটা আমি চাই। এই যে আমরা পড়াশুনো করছি বা করতে বলছি, সেটাও আমাদের সংগ্রাম পরিচালনারই একটি অঙ্গ। একথা কেন বলছি? না, আমরা দায়িত্ব বহন করছি, লড়াই পরিচালনা করছি, সাধারণ মানুষের কাছে আমাদের কথাগুলো পৌঁছে দিচ্ছি, তাদের বোঝাবার চেষ্টা করছি, তাদের শিক্ষিত করার চেষ্টা করছি, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই নিজেদেরও আমরা তৈরি করছি, শিক্ষিত করে গড়ে তুলছি। এখানে পড়াশুনো করাটা একটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের সাথে যুক্ত। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আমাদের অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস এবং প্রত্যয় গড়ে উঠছে। এটার জন্য প্রয়োজন আমাদের চিন্তাভাবনাকেও সুবিন্যস্ত করা। অবিন্যস্ত চিন্তা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে না পারলে চিন্তার ক্ষেত্রে নানা ধরনের জট দেখা দেয়, মানসিক বৈকল্য (mental disorder) দেখা দেয়। তাই আমরা চিন্তাপদ্ধতির (process of thinking) ওপর এত জোর দেই।

আর একটা কথা আপনাদের বুঝতে হবে। তা হচ্ছে, বিপ্লব মানে কী? কোন বিশেষ কার্যক্রমকে সম্পূর্ণ করার নাম কি বিপ্লব? না। একটা সমাজ পরিবর্তনের দ্বন্দ্বের ধারা-প্রতিধারার সফল পরিণতি হল বিপ্লব। যুগ যুগ ধরে বিপ্লব আসছে, বিপ্লব হয়ে চলবে। তাই বলছি, বিপ্লব হল ক্রমাগত সাধনা ও সংঘর্ষ, একটা বিরামহীন সংগ্রাম, এর শেষ নেই, এ একটা উচ্চস্তরের সংগ্রাম (a higher form of struggle)। আপনারা ভাবছেন, আজকের লড়াইটা খুব কঠিন। কিন্তু সমস্ত মহান কমিউনিস্ট নেতারা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন, বিপ্লবের পর তাকে রক্ষা করা, সংহত করা আরও কঠিন। বিপ্লব-পূর্ববর্তী সংগ্রামের মধ্যে উত্তেজনা আছে, আঘাত আছে। সে লড়াই করা এক অর্থে অনেক সহজ। বিপ্লবের পরে আরামের সুযোগ, স্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগ বেশি। সেখানে উত্তেজনার খোরাক কম। তখন রাষ্ট্রশক্তি আর প্রত্যক্ষ শত্রু থাকে না। তখন লড়াই করতে হয় অপ্রত্যক্ষ শত্রুর বিরুদ্ধে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আন্তর্জাতিক নীতি সম্পর্কে কোন বিচ্যুতি ঘটল কি না সে সম্পর্কে তীক্ষ্ণ ও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয় এবং সামান্যতম বিচ্যুতির হাত থেকেও তাকে রক্ষা করতে হয়। অর্থাৎ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর এক নতুন ধরনের সংগ্রামে প্রবেশ করতে হয়। এই যে আদর্শগত লড়াই যেটা বিপ্লবের আগেও করতে হয়েছে, সেটা কি খুব সহজ লড়াই? বিপ্লবের আগে লড়াইটা শুধু রাজনৈতিক লড়াই ছিল না, সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রেও লড়তে হয়েছে। এই যে সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে বিপ্লব সেটা বিপ্লবের আগেও যেমন দরকার, সেই বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্য বিপ্লবের পরেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তীব্র আদর্শগত লড়াই প্রয়োজন। মার্কসবাদের এটা বনিয়াদী শিক্ষা। তাই রুশ বিপ্লবের আগে লেনিনকে মাখ্-এর বিরুদ্ধে, টলস্টয়-এর বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে, এমনকী প্লেখানভ-এর বিরুদ্ধেও কলম ধরতে হয়েছে। শুধু অর্থনীতির ওপর কেতাব লিখেই হয়নি। বিপ্লবটা যদি শুধু অর্থনৈতিক লড়াই হত তাহলে আমাদের এত কিছু আলোচনার দরকার ছিল না। দর্শনের এত তত্ত্বের মধ্যে ঢোকারও কোন প্রয়োজন ছিল না।

বিপ্লবের প্রতি আনুগত্যের শক্তি অপরাজেয়

আর একটি বিষয় আলোচনা করেই আমি শেষ করব। ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনের যথার্থ প্রতিনিধি হিসেবে এস ইউ সি আই গড়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে পার্টির সমস্ত কর্মীকে একটি বিষয়ে আমি সচেতন করতে চাই। তা হচ্ছে, যে জনগণের জন্য আপনারা লড়ছেন, বহু সময় সেই জনগণের অনেকেই আপনাদের টিটকিরি দেবে, হয়তো বা মারধোর করবে — এ ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্য এস ইউ সি আই কর্মীদের প্রস্তুত থাকতে হবে। যে জনগণের জন্য আপনারা লড়ছেন, আপনাদের লড়াইয়ের উদ্দেশ্য না বুঝে বা ভুল বুঝে তারা আপনাদের অবমাননা করতে পারে। দুনিয়ার ইতিহাসে সকল বিপ্লবী আন্দোলনকেই প্রথম দিকে এইসব সহ্য করতে হয়েছে। এতে পিছিয়ে পড়ার কিছু নেই। একথা জেনেই আমরা নেমেছি যে, এই আন্দোলনে অনেক ঝঞ্ঝাট। বিপ্লবের এই সাধনায় তাই অনেক শক্তির দরকার। সে শক্তি হল জ্ঞানের শক্তি, সাধনার শক্তি, বিপ্লবের প্রতি আনুগত্য ও প্রত্যয়ের শক্তি, আর উন্নত নীতি-নৈতিকতার আধারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামের শক্তি। এটা শুধু নিজের মুক্তির জন্য নয়, সমস্ত মানুষের মুক্তির মধ্য দিয়েই নিজের মুক্তি অর্জনের জন্যই এটা প্রয়োজন। আপনারা সকলে সেই সংগ্রামে অনেক বেশি দায়িত্ব নেবেন, নিজেদের যথার্থ ও উপযুক্ত কমিউনিস্ট বিপ্লবী হিসেবে তৈরি করার জন্য নিরলস প্রচেষ্টায় নিমগ্ন থাকবেন — আপনাদের সকলের উদ্দেশে এই আবেদন জানিয়ে আমি এই স্কুল শেষ করছি।

অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে কুলতলির মানুষ লড়ছে

কুলতলিতে এস ইউ সি আইকে নিশ্চিহ্ন করার হীন উদ্দেশ্যে সিপিএম কীভাবে গ্রামে গ্রামে সন্ত্রাস, পুলিশ-প্রশাসনকে ব্যবহার করছে এবং সংবাদমাধ্যমে মিথ্যাপ্রচার চালাচ্ছে — নিম্নলিখিত ঘটনা তার এক জ্বলন্ত নজির।

দেউলবাড়ি অঞ্চলের দক্ষিণ দুর্গাপুর মৌজায় ১৫৫নং বুথে গ্রাম সংসদের সভা ৬ জুলাই সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে পঞ্চায়েত প্রধান সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের পুলিশি ব্যবস্থা রাখার জন্য আগেই অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু প্রধান তা করেননি। ফলে ৫ জুলাই এ বিষয়ে একটি মাস পিটিশন নিয়ে কুলতলি থানার ওসি'র সাথে এস ইউ সি আই নেতৃবৃন্দের আলোচনা হয়। সেই মতো ৬ জুলাই এস আই কৌশিক কুণ্ডু সহ ৩ জন কনস্টেবলের উপস্থিতিতে সভা শুরু হয়। এস ইউ সি আই এবং সিপিএম সমর্থকরা মাঠে দুই পাশে বসেন। গণনা শুরু হলে দেখা যায় এস ইউ সি আই-এর পক্ষে ৩৯১ জন এবং সিপিএমের পক্ষে ৩৪৯ জন উপস্থিত। এমতাবস্থায় প্রধান এবং উপপ্রধান এস ইউ সি আই-এর পক্ষে প্রস্তাব পাশের বিষয়টি লিখিতভাবে ঘোষণা করার জন্য সচিবকে নির্দেশ দেন। লেখা চলাকালীন সিপিএমের কিছু লোক পূর্ব পরিকল্পনা মতো গণনা ভুল হয়েছে বলে সোরগোল তুলে উপপ্রধান জলিল মোল্লাকে পুলিশের উপস্থিতিতেই বলপূর্বক টেনে নিয়ে যায় এবং সেই সুযোগে প্রধান কাঞ্চন নস্করও সভাস্থল ছেড়ে চলে যান। অথচ থানায় গিয়ে প্রধান উল্টে অভিযোগ জানান যে, পঞ্চজ মণ্ডল ও খলিল মোল্লার নেতৃত্বে এস ইউ সি আই কর্মীরা নাকি তাঁকে মারধোর করেছে, তাঁর শ্লীলতাহানি করেছে। তিনি ১৩ জনের নামে লিখিত অভিযোগ জানান। ঐদিন বিকালে কুলতলি থানায় গিয়ে এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে সমস্ত ঘটনা জানানো হয়। এস ইউ সি আই-এর বক্তব্য যে সত্য, তা এস আই-এর মারফত তিনি জেনেছেন বলে ওসি স্বীকার করেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এস ইউ সি আই কর্মীদের বিরুদ্ধেই কেস লেখেন। তখন এস ইউ সি আই প্রতিনিধিরা অভিযোগ দাখিল করতে চাইলে তিনি তাদের পরের দিন আসতে বলেন। কিন্তু পরদিন ৮ জুলাই সন্ধ্যায় থানায় যেতেই ওসি এস ইউ সি আই প্রতিনিধিদের গ্রেপ্তার করেন। কারণ ইতিমধ্যেই সিপিএম নেতা রবিরাম হালদার, বাক্কার সরদার, প্রভাস মাইতিরা থানায় এসে ওসি এবং এস আই-এর সঙ্গে শলাপরামর্শ করে গেছেন এবং তাদের নতুন নতুন অভিযোগের ভিত্তিতে এস ইউ সি আই কর্মীদের বিরুদ্ধে কেসে নতুন নতুন ধারা যোগ করা হয়েছে।

এই হ'ল উন্নততর বামফ্রন্টের আমলে আইনের শাসন। তবে এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে স্থানীয় সাধারণ মানুষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ — শত অত্যাচার-অবিচারেও তারা হার মানেনি — মানবে না।

সারা বাংলা কৃষক কনভেনশন

একের পাতার পর

করা হলেও আজও শিল্প গড়ে ওঠেনি। ফলে জমি দিলেই শিল্প হবে না। সরকার বলছে, জমির বিনিময়ে কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেবে। অথচ জলপাইগুড়ির চাঁদমণিতে চা-বাগান উচ্ছেদ করে যখন উপনগরী গড়ে তোলার পরিকল্পনা হয়, তখন উচ্ছেদ হওয়া শ্রমিকরা প্রতিবাদ করলে পুলিশের গুলিতে দু'জন নিহত হন। সেখানকার শ্রমিকরা আজও ক্ষতিপূরণ পাননি। তিনি বলেন, শুধু শিল্পের নামে নয়, হাইওয়ে-এক্সপ্রেসওয়ে, আবাসন প্রকল্প প্রভৃতিতেও লক্ষ লক্ষ একর জমি কৃষকদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। কৃষকদের আন্দোলনের চাপে পড়ে একদিকে রাজ্যের মন্ত্রীরা বলছেন, জমি ছাড়লে কৃষকদের চাকরি হবে; আবার শিল্পমন্ত্রী বলছেন, কাজ দেবে তো মালিক, তাই কাকে দেবে, তা তারাই ঠিক করবে। তিনি বলেন, কৃষক উচ্ছেদের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির কোন পার্থক্য নেই। তাই প্রধানমন্ত্রীর দল ও সরকারও যেহেতু রাজ্যে রাজ্যে কৃষক উচ্ছেদ চালিয়ে যাচ্ছে, তাই পশ্চিমবঙ্গে এসে একে 'একটি জাতীয় সমস্যা' বলে তিনি এর গুরুত্ব লঘু করে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। হুগলির সিঙ্গুরে কৃষিজমি রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে তপন দাস জানান — সিঙ্গুরের তিন-ফসলি জমি রক্ষার জন্য সেখানকার মানুষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁরা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কৃষক কমিটি ছাড়াও মহিলা কমিটি, যুব কমিটি, ছাত্র কমিটি গড়ে তুলেছেন। তিনি বলেন, সিপিএম নেতারা বাইরে থেকে যত বিভ্রান্তিই ছড়ান না কেন, সিঙ্গুরের মাটিতে তাঁরা পা রাখতে পারেননি।

কাটোয়ার কৃষি-কৃষক-খেতমজুর বাঁচাও কমিটির পক্ষে সেখ মহম্মদ বলেন, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নামে সরকার ৫৫০০ বিঘা জমি কেড়ে নিতে চলেছে। এর ফলে ২৯টি মৌজার ৩৩টি গ্রামকে উৎখাত হতে হবে। প্রায় ২ লক্ষ মানুষ সর্বহারায় পরিণত হবে। অথচ ২০০ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ৫০০-এর বেশি লোক লাগবে না। বাকিরা যাবে কোথায়? তাছাড়া কৃষকদের যে এখানে চাকরি হবে তারই বা নিশ্চয়তা কী? তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, এসব প্রশ্নের সরকার কোনও উত্তর দেয়নি। তিনি বলেন, কৃষকরা তাঁদের জমি ছাড়বেন না। তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন। তিনি বলেন, সরকারি কর্মচারীরা দু'ভ্যান পুলিশ নিয়ে জমি জরিপ করতে নেমেছিলেন। এলাকার মহিলা ও শিশুরা তাদের ঘেরাও করে রাখে। অবশেষে তাঁরা ফিরে যেতে বাধ্য হন। তিনি বলেন, রক্ত দিয়েও আমরা উচ্ছেদ রুখব। আমরা মনে করি, যার দেহে বল আছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ না করলে সে মৃত মানুষ।

হাওড়ায় কৃষক উচ্ছেদের ইতিহাস দীর্ঘ। বিধান রায়ের আমলে উচ্ছেদ শুরু হয়েছিল কোনা উপনগরী স্থাপনের নামে। '৮৪ সালে হাওড়া উপনগরীর জন্য উচ্ছেদ হয়েছে। বর্তমানে সিপুত্রা গোষ্ঠী গড়ে তুলেছে ওয়েস্ট ক্যালকাটা ইন্টারন্যাশনাল সিটি। সর্বত্রই হাজার হাজার কৃষক তাদের উর্বর জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে। বেশিরভাগেরই কোন ক্ষতিপূরণ জোটেনি। কৃষকদের প্রতি এই বঞ্চনার কথা উল্লেখ করে হাওড়ার সংগ্রামী কৃষক নেতা নির্ঝর সরদার বলেন, একক সংগ্রামে আজ আর জয়ী হওয়া যাবে না, প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের। তিনি বলেন, প্রতিবাদ করতে আমাদের দিল্লি যেতে হবে, আন্তর্জাতিক স্তরে যেতে হবে। এরাজ্যে কমিউনিস্ট শাসনের ভেক ধরে কীভাবে কৃষকদের জমিচ্যুত করা হচ্ছে তা বিশ্বকে জানাতে হবে।

শুধু জমি রক্ষার লড়াই নয়, বন্ধ্যা বীজে কীভাবে শত শত কৃষক সর্বস্বান্ত হয়েছে এবং ক্ষতিপূরণের দাবিতে লড়াই চলছে সেকথা জানালেন কোচবিহারের দিনহাটা কৃষক বাঁচাও কমিটির পক্ষে সুধাংশু বর্মণ। তিনি বলেন, আমাদের জমির আন্দোলন পৃথক কিছু নয়, সামগ্রিক কৃষক আন্দোলনেরই অংশ।

ভাঙড় জমি রক্ষা কমিটির জলিল ঢালী বলেন, চর্মশিল্প নগরীর জন্য কতদিন আগে জমি নিয়েছে সরকার, আজও তার ক্ষতিপূরণ দেয়নি, পুনর্বাসনও হল না। উচ্ছেদ হওয়া ৪০০ পরিবারের মধ্যে মাত্র ২৬৬টি'র জন্য ঘর বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেখানে আলো নেই, পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা নেই। বাকিরা খোলা আকাশের নিচে দিন কাটাচ্ছে। সরকার একের পর এক মিথ্যাচার করে চলেছে।

বারুইপুরের আসগর সরদার বলেন, এখানে ২১০০ একর জমি নেবে সরকার। এর মধ্যে ১৩০০ একর চাষজমি। বাকি সবই ফলের বাগান। বারুইপুরের পেয়ারা চাষ আজ শিল্পে পরিণত হয়েছে। পেয়ারা ছাড়াও লিচু, আম, কাঁঠাল চাষ হয় এখানে। তিনি বলেন, বারুইপুরেই লোকনাথ কটন মিল বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। সরকার সে জমি অধিগ্রহণ না করে কৃষকদের জমি কেড়ে নিতে চাইছে।

নন্দীগ্রাম কৃষিজমি ও জনস্বার্থ রক্ষা কমিটির পক্ষে নন্দ পাত্র বলেন, একটি ব্লক থেকে ১৭,০০০ একর কৃষিজমি অন্য কোথাও নেওয়ার নজির আছে কি না আমাদের জানা নেই। সরকার নাকি এখানে 'কেমিকেল হাব' গড়বে। সেটি কী জিনিস, কী তার রূপ কৃষকরা কিছুই জানে না। সরকার ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে, এর মধ্যে ২০০০ একর খাস জমি, এছাড়াও নদীতীরে ১০০০ একর জমির ক্ষতিপূরণ কেউ পাবে না। এর আগেও সরকার ২৫৬ একর জমি চাষীদের থেকে নিয়েছিল, তার ক্ষতিপূরণ আজও মেলেনি। তিনি বলেন, কৃষকরা সংগঠিত হচ্ছে। বি এল আর ও, জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছে চাষীরা, কনভেনশন হচ্ছে।

দার্জিলিং-এর ফুলবাড়ি বাস্তু ও কৃষিজমি রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে এসেছিলেন আবুল কাশেম। তিনি বলেন, গোটা জেলা জুড়েই কোথাও ২০০ একর কোথাও ৩০০ একর জমি নেওয়া হচ্ছে। ফুলবাড়িতে ৭০০ একর কৃষিজমি নিয়ে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছে সরকার। এখানকার কৃষকরা কঠোর পরিশ্রম করে চাষ করেন। তাও যদি সরকার কেড়ে নেয় তাহলে কৃষকরা খাবে কী? তিনি বলেন, চাষীরা জমি অনেক দিয়েছে, কিন্তু চাষীদের উন্নয়ন হয়নি। তাই তারা কমিটি গড়ে তুলে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। আন্দোলনের চাপে পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য কমিটির সাথে আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়েছেন।

উত্তর ২৪ পরগণার বাগদা থেকে এসেছিলেন প্রফুল্ল মণ্ডল। বাগদার বিস্তৃত এলাকার জমি খাস ঘোষণার বিরুদ্ধে তিনি দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে আসছেন। তিনি বলেন, এ নিয়ে আমি মমতা ব্যানার্জীর কাছে গিয়েছি, রঞ্জিত পাঁজার কাছে গিয়েছি, অর্জুন সিংয়ের কাছে গিয়েছি, কোথাওই কোন সাড়া পাইনি। শেষপর্যন্ত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের সাথে আমার যোগাযোগ গড়ে ওঠে। তিনি বলেন, এই সংগঠনের সঙ্গে এসে আজ আমি যেন আকাশে উঠে গেছি। আবার এলাকায় আন্দোলন গড়ে তুলছি। চাষীদের সংঘবদ্ধ করছি।

কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট কাজি সফিউদ্দিন বলেন, ১৮৯৪ সালের যে আইনকে কাজে লাগিয়ে সরকার এই উচ্ছেদ চালাচ্ছে, সেই আইন পরিবর্তনের দাবি জানাতে হবে। সরকার বলছে, যারা উচ্ছেদের বিরুদ্ধে তারা উন্নয়নেরও বিরুদ্ধে। আজ বড় বড় দলগুলি পুঁজিপতিদের কাছে মাথা বিকিয়ে দিয়েছে। তারা কেউ উন্নয়নবিরোধী ছাপ গায়ে লাগাতে চায় না। তিনি বলেন, সিঙ্গুরে যে মা-বোনেরা তথাকথিত

সাতের পাতায় দেখুন

শ্রীনগর ও মুম্বই বিস্ফোরণ

একের পাতার পর

সাধারণ মানুষ নয়। তাছাড়া বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, মুম্বই বিস্ফোরণে যে বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছে, তা আর ডি এক্স নয়। স্বভাবতই এ প্রশ্নও না উঠে পারে না যে, লস্কর বা জৈসের মতো অত্যন্ত সুসংগঠিত ও সুশিক্ষিত জঙ্গিরা জিলোটিন স্টিক বা ডিনামাইটের মতো বিস্ফোরক ব্যবহার করছে — সেটা কি বিশ্বাসযোগ্য? সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয় এজন্য যে, ব্যবহৃত বিস্ফোরক আর ডি এক্স নয়, একথা বলার পরই, তদন্তের কাজে নিয়োগের মাত্র একদিন পরেই বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ রাকেশ মারিয়াকে বদলি করা হয়েছে। সংবাদপত্রেও লেখা হয়েছে যে, ''লস্কর-ই-তৈবার সঙ্গে সিমি এবং আলকায়দার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নিয়ে বহু বাক্যব্যয় করা হলেও সত্যিই তারা এই বিস্ফোরণে জড়িত কিনা তা নিয়ে সন্দেহের ভ্রূকুটি দেখা দিয়েছে ... বিস্ফোরণের বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা থেমে নেই।'' (প্রতিদিন, ১৫-০৭-০৭) অন্যদিকে লক্ষ্য করা গেছে, এ ধরনের হামলার ঘটনায় সর্বদাই ''জঙ্গিরা'' মারা যায়। কখনোই তাদের জীবিত অবস্থায় ধরা যায় না। আবার সন্দেহভাজন যাদের ধরা হয় এবং বলা হয় ''বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কট্টর জঙ্গি নেতা'', দেখা যায়, তারা পুলিশ হেফাজতে এসেই কোন জুলুম-অত্যাচার ছাড়াই গড়গড় করে ইসলামি জঙ্গী সংগঠনের প্ল্যান-প্রোগ্রাম, পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ সব ''ফাঁস করে দেয়''।

কাশ্মীরের ঘটনাতেও দেখা গেছে, পুলিশ লস্কর-ই-তৈবার অন্যতম শীর্ষনেতা কমান্ডার বিলালকে কোন রেকর্ড না রেখে রাস্তা থেকে কিডন্যাপের কায়দায় তুলে আনার পর বিলাল বলে দিয়েছে, লস্কর-ই-তৈবা মুম্বই বিস্ফোরণের জন্য আর ডি এক্স পাঠিয়েছে (দ্য টাইমস্ অব ইন্ডিয়া ১৫.৭.০৭)। এদিকে ফরেনসিক রিপোর্ট জানিয়েছে যে, বিস্ফোরক আর ডি এক্স নয়। আবার এই রিপোর্ট দেওয়ার পরই বিশেষজ্ঞ রাকেশ মারিয়াকে বদলি করা হয়েছে। একসঙ্গে এতগুলি অসঙ্গতির জবাব কি? এসব কিছু ঘটে যাওয়ার পর সর্বশেষ জানা গেছে, লস্কর-ই-কাহার নামে এক অখ্যাত সংগঠন নাকি বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেছে। মুম্বইয়ের রেলপথে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় একের পর এক বিস্ফোরণ যে একটা অত্যন্ত দক্ষ ও সুসংগঠিত শক্তির কাজ এবং সেই সাথে বহু লোক ও বড়সড় পরিকল্পনার পরিণাম তা বুঝতে গোয়েন্দা হওয়ার দরকার নেই। নাম-না-জানা একটা ক্ষুদ্র সংগঠনের পক্ষে কি একাজ সম্ভব? নাকি বহু অসঙ্গতিকে মিলিয়ে দেওয়ার জন্য লস্কর-এ-কাহারের দায়স্বীকারও পাকা মাথার খেলা? এসব প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই না উঠে পারেনা। ১৬ জুলাই সংবাদে প্রকাশ, কুখ্যাত মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তর এফ বি আই নাকি আগেই ভারতীয় গোয়েন্দাদের এ বিষয়ে সতর্ক করেছিল। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এই সংবাদের কোন প্রতিবাদ হয়নি। তা যদি হয়, তবে ভারতীয় গোয়েন্দারা তা গুরুত্ব দিয়ে দেখেনি কেন? মনে রাখা দরকার, ভারতীয় গোয়েন্দা দপ্তর দুর্বল, অদক্ষ বা অযোগ্য নয়। সেই দপ্তর এফ বি আইয়ের এত গুরুত্বপূর্ণ হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও তা উপেক্ষা করল কেন, যার জন্য এতগুলি মূল্যবান প্রাণ চলে গেল? সংবাদে আরও প্রকাশ মুম্বই পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল পি এস পাসরিকা বলেছেন — ''মুম্বই বিস্ফোরণের ঘটনায় স্থানীয় কয়েকজন রাজনীতিকের উপর নজর রাখা হচ্ছে।'' (প্রতিদিন, ১৫-০৭০৭)। প্রশ্ন হল — এই স্থানীয় রাজনীতিকরা কারা? কোন দলের? তাদের পৃষ্ঠপোষক কারা? কী তাদের স্বার্থ?

যেকোন অপরাধের তদন্তে মোটিভ একটা বড় সূত্র। দেখা দরকার, এধরনের ঘটনা কোন অবস্থা এবং পরিবেশে ঘটছে এবং কারা কারা এর থেকে লাভবান হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রথমত দেখতে হবে, ভারত সরকার কি সত্যিই সন্ত্রাসবিরোধী? মার্কিন সরকার ও তার বন্ধু ভারত সরকার কি প্রকৃতই চায় দুনিয়া থেকে সন্ত্রাসবাদের অবসান হোক? না, তা চায় না। সম্প্রতি ইজরায়েলি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদীরা যেভাবে লেবাননে বিমান হানা চালিয়েছে তা নিন্দা করা দূরে থাক, মার্কিন সরকার ইজরায়েলকেই এ ব্যাপারে সমর্থন করেছে। জি৮-এর সভায় তারা ইজরায়েলকে আক্রমণ বন্ধ করতে নয়, সংযত হতে বলেছে। সাথে সাথে বলেছে, ইজরায়েল নাকি আত্মরক্ষা করছে। ইজরায়েলি আক্রমণের জন্য তারা সিরিয়া এবং ইরানকে দায়ী করেছে। ইঙ্গ মার্কিন মদতে ইজরায়েল রাষ্ট্রসংঘকে উপেক্ষা করে লেবাননের অসামরিক লক্ষ্যবস্তুর ওপর বিমান হানা চালিয়ে যাচ্ছে। ভারত সরকার তার মার্কিন ঘেঁষা নীতি এবং মধ্যপ্রাচ্যে ভারতবর্ষের পুঁজিবাদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে, ধরি মাছ না ছুঁই পানি অবস্থান নিয়েছে। সরাসরি পক্ষে না বললেও ইজরায়েলের এতবড় আক্রমণের নিন্দা তারা করেনি। অতীতে শ্রীলঙ্কার জঙ্গীসংগঠন এলটিটিই-কে ভারত সরকার সবরকম মদত দিয়েছে। আবার পাকিস্তানকে সন্ত্রাসের জন্য দায়ী করলেও তাদের প্রধান মদতদাতা মার্কিন সরকারকে ভারত সরকার কখনও কাঠগড়ায় দাঁড় করায়নি। পাকিস্তানকে মদত দেওয়ার জন্য জর্জ বুশকে সন্ত্রাসের মদতদাতা বলেনি ভারত সরকার। অর্থাৎ জনবিরোধী শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার কখনো সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বলছে, আবার নিজ স্বার্থে কখনো সন্ত্রাসবাদীদের মদত দিচ্ছে। এই যাদের অতীত ইতিহাস, মুম্বই বিস্ফোরণে বা কাশ্মীরের ঘটনায় তাদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ যোগ আছে কিনা তা প্রশ্নাতীত নয়।

তার উপর এই ঘটনাগুলি ঘটেছে এমন সময়ে যখন সর্বভারতীয় শাসকদল কংগ্রেস, তার দোসর সিপিএম এবং প্রধান বিরোধী দল বিজেপি খুবই অসুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। গত দু'বছরে, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য দূরীকরণ, খেতমজুরদের বছরে একশো দিন কাজ দেওয়া, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সহ প্রতিটি প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যর্থ হয়েছে। ন্যূনতম সর্বসম্মত কর্মসূচি অক্লেশে পদদলিত করে তারা এন ডি এ-র মতই নগ্নভাবে একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থ দেখছে। এর দায় সিপিএমের ওপরও বর্তাচ্ছে। বাইরে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মৃদু সমালোচনা করে মুখরক্ষা, আর ভেতরে কংগ্রেসকে পূর্ণ সমর্থন — তাদের এই দ্বিচারিতা ধরা পড়ে গিয়েছে। মূল্যবৃদ্ধি ও বেকার সমস্যার চাপে জনজীবন বিপর্যস্ত। ফলে কংগ্রেস পরিচালিত ও সিপিএম সমর্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে জনরোষ মারাত্মক রূপ নিচ্ছে। এ অবস্থায় জনগণের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে পারলে কংগ্রেস-সিপিএম আপাতত কিছুটা স্বস্তি পেতে পারে। অন্যদিকে অস্তিত্বের সঙ্কটে জর্জরিত বিজেপিও সাম্প্রদায়িক ইস্যু খুঁজছে। এ অবস্থায় কাশ্মীর ও মুম্বই বিস্ফোরণ তাদের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ। ফলে এ ধরনের মর্মান্তিক ঘটনার পর কেবল বিদেশি শক্তিকে দায়ী করে দায় এড়িয়ে গেলে চলবে না। দেশের স্বার্থে ও জনস্বার্থে প্রয়োজন প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন।

দুর্নীতির প্রতিবাদ করায় পুলিশ অফিসারকেই ভিজিলেন্সে ফাঁসিয়ে দেওয়া হল

বিধানসভায় কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার

সপ্তম সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর বিধানসভার প্রথম অধিবেশনে রাজ্যপাল ভাষণ দেন, যার মধ্য দিয়ে সরকারের বক্তব্যই প্রকাশিত হয়েছে। এর উপর বিতর্কে অংশ নিয়ে এস ইউ সি আই পরিষদীয় নেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলেন, বিশেষত নাগরিক জীবনের নানা সমস্যা সমাধানে এই সরকারের চূড়ান্ত ব্যর্থতা ও সামগ্রিক জনবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির তিনি তীব্র সমালোচনা করেন।

তিনি বলেন, সংসদীয় গণতন্ত্রে ন্যূনতম একটা শিষ্টাচার আছে। তা হচ্ছে, যখন রাজ্যপালের ভাষণের উপর আলোচনা হবে, যেহেতু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জবাবি ভাষণ দেবেন সেইহেতু তিনি হাউসে উপস্থিত থাকবেন। কিন্তু আমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না, তিনি নাকি সালেম গোষ্ঠীকে নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত! যাই হোক, রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব সরকার পক্ষ এনেছে, আমি তার তীব্র বিরোধিতা করছি। যে কাট্ মোশানগুলো আছে, আমি সেই কাট্ মোশানগুলোকে সমর্থন করে কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমি প্রথমেই কৃষির উপর যে ভয়াবহ আক্রমণ এবং আঘাত নেমে এসেছে সেই বিষয়ে বলতে চাইছি। আমাদের রাজ্যের ঐতিহ্যশালী শিল্প, বিশেষ করে পাট শিল্প থেকে শুরু করে সমস্ত কর্মসংস্থানমুখী শ্রমনিবিড় শিল্পগুলো যখন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, যখন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলো বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে এবং শ্রমিক ছাঁটাই করা হচ্ছে, চারিদিক থেকে বেকার সমস্যা যখন একটা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে, তেমন একটা পরিস্থিতিতে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে যেখানে শ্রমনিবিড় শিল্প গড়ে তোলা দরকার ছিল **সেখানে পুঁজি নির্ভর, প্রযুক্তি নির্ভর খুব কম কর্মসংস্থান হয় এইরকম ২-৪টি শিল্পের প্রস্তাব তুলে 'শিল্পায়ন হচ্ছে', 'উন্নয়ন হচ্ছে' বলে হইচই করা হচ্ছে।** শিল্পায়নের কথা বলে আজকে পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন জেলায় ৪০ হাজার একর উর্বর জমি অধিগ্রহণ করতে যাচ্ছে। অথচ এই সমস্ত উর্বর জমি অধিগ্রহণ না করেও গঙ্গার দু'ধারে যে সমস্ত বন্ধ কারখানার জমি আছে, প্রায় ৪০ হাজার একর সরকারি জমি আছে, সেই জমিকে তাঁরা অধিগ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু সেই জমিগুলো কারখানার মালিকদের প্রোমোটারদের দিয়ে আবাসনের ব্যবসা করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, এইসব জায়গায় যেসব অনাবাদী জমি আছে সেখানে এইসব শিল্প হতে পারত। তাঁরা তা করলেন না। সেই জায়গায় হুগলির সিঙ্গুরে এবং বিভিন্ন জেলায় যে সমস্ত উর্বর জমি আছে সেই জমিগুলো তাঁরা নতুন করে অধিগ্রহণ করছেন। তার ফলে ভূমিহীনদের সংখ্যা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যাচ্ছে। এমনিতেই কৃষি সমীক্ষায় জানা গেছে, উন্নয়নের জন্য, প্রতি বছর ৫০ হাজার একর জমি নগরায়ণ ও অন্যান্য কাজে চলে যাচ্ছে কৃষি জমি থেকে। গত ৫ বছরে ২৫ লক্ষ চাষী ভূমিহীন হয়েছে। এখন ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা ৭৩ লক্ষের উপরে। গত ৫ বছরে ১ লক্ষ ২০ হাজার একর জমি কমে গেছে। জমি যেভাবে কমছে এবং চাষী যেভাবে উচ্ছেদ হচ্ছে তাতে বেকার সমস্যা ভয়াবহ রূপ নেবে এবং খাদ্য নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে উঠবে। আমরা কৃষক ও খেতমজুরদের চাষের জমি ও বাস্তুজমি থেকে উচ্ছেদ করার নীতির তীব্র বিরোধিতা করছি।

শুধু তাই নয়, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে চাষীর উপরে আর এক দফা আক্রমণ শুরু হয়েছে। ২০০৬-'০৭ সালে নতুন যে বিদ্যুৎ মাশুল ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে কৃষিবিদ্যুৎ গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ১৮ শতাংশ বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০০৫-'০৬ সালে কৃষিবিদ্যুৎ মাশুল ভয়ঙ্করভাবে বৃদ্ধি করা হয়। তখন তার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়েছিল, তাতে লাঠি, গুলি চলেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আন্দোলন থামেনি। মুখ্যমন্ত্রী নিজে স্বীকার করে বলেছিলেন যে, হ্যাঁ, কৃষিবিদ্যুৎ মাশুল বেশি ধার্য করা হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, এ্যাডহক ব্যবস্থা নেবেন এবং ২০ কোটি টাকা ভর্তুকি দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। পরবর্তী বৎসরে বিদ্যুৎ মাশুল ঘোষণার সময়ে কৃষিবিদ্যুতের দাম কমানো হবে বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। এবারে বিদ্যুৎ মাশুল যা ঘোষিত হলো, তাতে ২০ কোটি টাকা যে ভর্তুকি দেওয়া হয়েছিল সেটাও তুলে নেওয়া হয়েছে। অথচ দেখা যাচ্ছে, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, এইসব রাজ্যে কৃষিতে বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। বিভিন্ন জায়গায় কৃষিবিদ্যুৎ যেখানে ইউনিট প্রতি ৫০ পয়সা, সেখানে আমাদের রাজ্যে বিদ্যুতের দাম তিন টাকা ধার্য করা হয়েছে। অপরদিকে, ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ২ টাকা করে বেড়ে গেছে। কৃষকদের কী করুণ অবস্থা! একদিকে বিদ্যুতের দামবৃদ্ধি হয়েছে, অপরদিকে ডিজেলের দামবৃদ্ধি হয়েছে। আবার কৃষক তাঁদের ফসলের ন্যায্য দাম যে পাবে, তার কোন গ্যারান্টি নেই। আজকে পশ্চিমবাংলার কৃষকদের এমন অবস্থা যে তারা ঋণের জালে জড়িয়ে হয় ভিক্ষুকে পরিণত হবে, নতুবা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হবে। কৃষকদের ব্যাপারে রাজ্য সরকার কিছু ভাবছেন না। তাদের উপরে যে আঘাত হেনেছেন সেটা একবার ভেবে দেখুন। ওড়িশার কলিঙ্গনগরে কৃষকদের উপর এইভাবে আক্রমণ হয়েছিল। সেখানে বিস্ফোরণ হয়েছিল, ১২ জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। এর বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়েছিল, ওড়িশা সরকার সেই আন্দোলনের সামনে নতি স্বীকার করেছিল — যারা কৃষিজমি থেকে উৎখাত হবে, তাদের পরিবারের একজন করে চাকুরি পাবে বলে তারা ঘোষণা করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেটুকু প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছে না।

আজ শিক্ষার উপরে নানা দিক থেকে আঘাত নেমে আসছে। শিক্ষায় অর্থবরাদ্দের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার দায়দায়িত্ব নিচ্ছে না। শিক্ষাকে ক্রমশ বেসরকারীকরণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। হংকংয়ে ডবলু টি ও'র যে সম্মেলন হল, সেখানে কীভাবে শিক্ষার সমস্ত ক্ষেত্রে দেশি এবং বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ হবে, কীভাবে শিক্ষাকে পণ্যে পর্যবসিত করা যায়, সেই মর্মে চুক্তি হলো। আজ রাজ্যে স্বাস্থ্যের অবস্থা বেহাল। স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্বন্ধে পশ্চিমবাংলার মানুষ ভুক্তভোগী। এখানে মুখ্যমন্ত্রী কপট উদ্বেগ দেখাচ্ছেন। কয়েকদিন আগে আমরা লক্ষ্য করেছি, পাবলিকের কাছে তিনি ভাষণ দিয়ে বলেছেন, রাজ্য সরকারের সীমাবদ্ধতা আছে। এখন আবার স্বাস্থ্যের বেহাল অবস্থার জন্য সূর্যবাবুকে সামনে রেখে তিনি তিরস্কার করেছেন। এসব কপট ক্ষোভ। আমাদের রাজ্যে ৪,৫০৬টি পিছিয়ে-পড়া গ্রাম — যা চিহ্নিতও হয়েছে, সেখানে এখনও উন্নয়নের ব্যবস্থা হল না কেন? কয়েকদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের দলের যুব সংগঠনের সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে কর্মসংস্থানের সমস্যার সমাধান হবে না, যার জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ে তুলতে হবে। কথাগুলি শুনতে ভালো লাগে। মুখ্যমন্ত্রী যখন ভাষণ দেন তখন মনে হয় তিনি যেন এই সমস্ত জ্বলন্ত সমস্যা সম্পর্কে খুবই উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত। কিন্তু বাস্তবে সমস্যা নিরসনের পথে না গিয়ে ঠিক তার বিপরীত পথে বিশ্বায়ন, উদারীকরণ, বেসরকারীকরণের পথে তিনি এগিয়ে চলেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনকল্যাণমুখী পরিষেবা সমস্তটাই আজ বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, যার ফলে জনজীবনে চূড়ান্ত দুর্দশার সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং মুখ্যমন্ত্রীর এ ধরনের ভাষণ জনগণের প্রতি চরম প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে রাজ্যের আইন- শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করছি। রাজ্যে চুরি, ডাকাতি, হত্যা, নারীধর্ষণ, নারীপাচার ইত্যাদি মারাত্মক ঘটনা ঘটছে। পুলিশের চোখের সামনে নারীপাচার হচ্ছে। পুলিশ সব জানে। আজকে পুলিশ অফিসাররা শাসক- দলের স্বার্থে তাদের আজ্ঞাবহ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। নিকৃষ্টভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পুলিশ দফতরের গুরুত্বপূর্ণ অফিসারদের দুর্নীতির কথা পুলিশ অফিসার নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে ভিজিলেন্সে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন। এবার ফ্রন্ট সরকারের স্লোগান ছিল, "দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে", "দুর্নীতির প্রতিবাদ করতে হবে।" অথচ দুর্নীতির যিনি প্রতিবাদ করলেন তার বিরুদ্ধেই ভিজিলেন্স লাগানো হল। এই ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী? মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মুখ্যমন্ত্রী উন্নয়নের কথা বলেন, ভোটের সাফল্যের কথা বলেন। সিপিএম এবার নির্বাচনে ২৩৫টি সিট পেয়েছে, কিন্তু জনগণের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া, কোন উচ্ছ্বাস, কোন আনন্দ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। জনগণ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। উল্লসিত হয়েছে দেশি-বিদেশি শিল্পপতি ও সমগ্র বণিকসভা। যাঁরা ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র, যারা প্রবীণ তাঁরা জানেন, নবীনরা হয়ত জানেন না যে, সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের তৃতীয় বিশ্বজোড়া তীব্র বাজার সঙ্কটের যুগে প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশেই অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থার অবসান ঘটেছে। আগে আমরা সরকার বলতে বুঝতাম, "গভর্নমেন্ট বাই দ্য পিপ্‌ল, অফ দ্য পিপ্‌ল, ফর দ্য পিপল।" কিন্তু এখন আমরা সরকার বলতে বুঝি "গভর্নমেন্ট বাই দ্য বুর্জোয়া, অফ দ্য বুর্জোয়া, ফর দ্য বুর্জোয়া।" আজকে টু-পার্টি ডেমোক্রেসিতে বুর্জোয়ারাই সবকিছু নির্ধারণ করে। সংসদীয় গণতন্ত্রে কে ক্ষমতায় আসবে এটা তাদের সিদ্ধান্ত। পশ্চিমবঙ্গে সংসদীয় গণতন্ত্রে সিপিএমকে সরকারি ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে এবারের নির্বাচনে সিপিএমের পিছনে বুর্জোয়াদের পুরোপুরি মদত ছিল। কারণ ওরা যেভাবে পুঁজিপতিশ্রেণী, শিল্পপতিদের অনুগত হয়ে কাজ করছে তাতে তারা খুশি। গত ৩০ বছর ধরে পশ্চিমবাংলায় 'বামফ্রন্ট' ক্ষমতায় থেকে রাজ্যটাকে শেষ করে দিয়েছে। যে পশ্চিমবাংলা ছিল একসময় গণআন্দোলনের পীঠস্থান, যা একসময় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল, যে পশ্চিমবাংলা একসময় কংগ্রেসিদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল, সেই পশ্চিমবাংলাকে সিপিএম শেষ করে দিচ্ছে, নির্বীর্য করে দিচ্ছে। এটাই সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের একমাত্র ও সবচেয়ে বড় সাফল্য, যেজন্য দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের কাছে সিপিএম আজ সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য শক্তি, যারা গণআন্দোলনকে প্রশমিত করতে পারবে ও পুঁজির শোষণের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে পারবে। এই বলে তিনি রাজ্যপালের ভাষণের উপর আনীত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

সারা বাংলা কৃষক কনভেনশন

ছয়ের পাতার পর

উন্নয়নপন্থীদের ঝাঁটাপেটা করেছেন, তাঁদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। উন্নয়নের ভূত ছাড়াতে এই ঝাঁটাই দরকার।

রাজ্যের কৃষক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার বলেন, সভায় বক্তাদের কথাগুলি সকলের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগিয়েছে। সর্বত্রই যাঁরা আক্রান্ত, তাঁরা আজ প্রতিরোধের জন্য বদ্ধপরিকর। তাঁরা বলছেন, এক বিন্দু রক্ত থাকতে এক ইঞ্চিও জমি দেব না। এটা শুধু কথার কথা নয়। তিনি বলেন, মাত্র কিছুদিন আগেই বিদ্যুতের দাবিতে কৃষকরা দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, আমরণ অনশনে বসেছিলেন। শেষপর্যন্ত সরকারকে দাবি মানতে বাধ্য করেছিলেন। সেটা ছিল একটা আংশিক আক্রমণ। এই সর্বব্যাপক আক্রমণের বিরুদ্ধেও যদি দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলা যায় তবে সরকারকে এই সর্বনাশা পদক্ষেপ থেকে সরে আসতে বাধ্য করা যাবে। তিনি বলেন, সর্বত্র আপনারা মহিলা কমিটি, যুব কমিটি গড়ে তুলুন। এইগুলিই ব্যাপক আন্দোলনের সংগ্রামী হাতিয়ার হিসাবে কাজ করবে। বিভিন্ন জায়গায় গড়ে ওঠা আন্দোলনগুলি ইতিমধ্যেই যতটুকু ছাপ ফেলেছে তাতেই আমার বিশ্বাস এ আন্দোলন জয়যুক্ত হবেই।

কৃষক নেতা কমরেড শঙ্কর ঘোষ বলেন, দেশি-বিদেশি অলস পুঁজি আজ আবাসনে খাটতে চাইছে। কারণ পুঁজিবাদের মারাত্মক সঙ্কটের কারণে তা আজ উৎপাদন ক্ষেত্রে খাটতে পারছে না। আবাসন ব্যবসার জন্য তাদের প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ জমি। রাজ্যের সিপিএম সরকার সেই কাজে প্রধান সহযোগী হিসেবে তাদের জমির খিদে মেটানোর দায়িত্ব নিয়েছে। তিনি বলেন, সরকারের জমি দখলের বিরুদ্ধে কৃষকদের মধ্যে সর্বত্রই একইরকম আবেগ, একইরকম ঐক্যবদ্ধতা আমরা লক্ষ্য করছি।

রাজ্যের কৃষক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেত্রী ১৯৬৯ সালে রাজ্যের দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী কমরেড প্রতিভা মুখার্জী বলেন, আন্দোলনের জন্য চাই সঠিক নীতি, সঠিক আদর্শ। সংগ্রাম আমাদের দেশে কম হয়নি, অনাহারে মানুষ কম মারা যায়নি। কিন্তু আন্দোলনে জয়লাভ হবে না যদি সঠিক নেতৃত্ব না থাকে। চাই এমন নেতৃত্ব যারা সরকার, পুঁজিপতিশ্রেণীর চরম আক্রমণের মুখে কৃষকদের ফেলে পালিয়ে যাবে না। সিপিএম আজ বামপন্থার ঝান্ডা ফেলে দিয়েছে। তিনি বলেন, মালিকরা নয়, সংখ্যায় জনগণই বেশি, দেশের ৮০ ভাগই কৃষক। পুঁজির মালিকদের স্বার্থে সেই কৃষকদেরই আজ ওরা মারতে চাইছে। তিনি বলেন, সরকারের সংগঠিত আক্রমণের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করতে হবে। তাই রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে সংগঠিত আন্দোলনগুলিকে এক ঐক্যের সুরে বাঁধতে রাজ্যব্যাপী এক সংগ্রামী কমিটি আজ গঠিত হবে। সেই কমিটি রাজ্যস্তরে আন্দোলন গড়ে তুলবে, কিন্তু মূল লড়াই আপনাদের জমিতেই গড়ে তুলতে হবে, যে জমি সরকার কেড়ে নিতে চাইছে। তিনি রাজ্যের কৃষকদের উদ্দেশে বলেন, মরে তো আছি, আসুন মরার আগে একবার বাঁচার চেষ্টা করি। বাঁচার লড়াইয়ে সামিল হই।

কনভেনশনের সভাপতি সেখ খোদাবক্স আন্দোলনের বার্তাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কৃষকদের কাছে আবেদন জানান। সারা বাংলা কমিটি'র প্রস্তাবিত সদস্যদের নাম সভায় পেশ করেন বিশিষ্ট কৃষক নেতা মদন সরকার। উপস্থিত প্রতিনিধিরা হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। আন্দোলনকে রাজ্যব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার এক নতুন প্রেরণা নিয়ে প্রতিনিধিরা ফিরে যান।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

স্বায়ত্তশাসনের নামে মেডিক্যাল কলেজগুলিকে বেসরকারীকরণের ষড়যন্ত্র অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের ঐতিহ্যমণ্ডিত মেডিক্যাল কলেজগুলি নিজস্ব সমিতির হাতে তুলে দিয়ে নিজের আর্থিক দায়ভার অস্বীকার করার যে পদক্ষেপ নিয়েছে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৬ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন—

''রাজ্য সরকার রাজ্যের ঐতিহ্যমণ্ডিত মেডিক্যাল কলেজগুলিতে সমিতি গঠনের যে নির্দেশ দিয়েছে এবং স্বায়ত্তশাসনের নামে কলেজগুলিকে টাকা সংগ্রহ-সম্পত্তি কেনাবেচা-স্টাফ ছাঁটাই ইত্যাদির অধিকারগুলি দিয়ে আর্থিক দায়ভার মুক্ত হতে চলেছে — আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

''গরিব ও নিম্নবিত্ত মানুষের চিকিৎসা পাওয়ার এই স্তম্ভগুলি এর ফলে কার্যত কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের চেহারা নেবে। সরকারের পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ নীতি যা আসলে শিক্ষা-স্বাস্থ্য ক্ষেত্রকে ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়ার নীল নক্সা —এই সার্কুলার তারই প্রয়োগ। এর ফলে একদিকে গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সামনে সরকারি মেডিক্যাল কলেজের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে, অন্যদিকে গরিব মধ্যবিত্তদের ফ্রি-চিকিৎসার সুযোগ বন্ধ হয়ে যাবে।

''তাই অবিলম্বে জনবিরোধী এই সরকারি সার্কুলার প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।''

মহান সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসটির প্রকাশনা ও নিষিদ্ধ হওয়ার ৮০ বৎসর উপলক্ষে '১২৫তম শরৎচন্দ্র জন্মবার্ষিকী কমিটি'র উদ্যোগে গত ৫ জুলাই কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল, 'স্বদেশী আন্দোলন, বিপ্লববাদ ও শরৎচন্দ্র'। প্রধান আলোচক ছিলেন বিশিষ্ট জননেতা প্রভাস ঘোষ। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট ভূ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর ঘটক। জন্মবার্ষিকী কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে শরৎচন্দ্রের উপর একটি সংকলন গ্রন্থ আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হবে।

প্রশাসনিক হয়রানির প্রতিবাদে উত্তর ২৪ পরগণা জেলাশাসক দপ্তরে মোটরভ্যান চালকদের বিশাল অভিযান

মোটরভ্যান চালকদের উপরে প্রশাসনিক হয়রানি রুখতে, পরিবহনের অন্যান্য যানের সাথে সমমর্যাদা দিয়ে তাদের লাইসেন্স প্রদান সহ ৬ দফা দাবিতে ৭ জুলাই বারাসতে জেলাশাসক দপ্তরে সহস্রাধিক মোটরভ্যান চালক বিক্ষোভ দেখান। পরে তারা মিছিল করে আরটিএ (পরিবহন) অফিসে যান। সেখানে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তারা প্রশাসনের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন এবং দাবিপূরণ না হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। শ্রমিক সংগঠন ইউ টি ইউ সি-এল এস নেতা কমরেড অশোক দাস, মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের জেলা আহ্বায়ক কমরেড জয়ন্ত সাহা সহ ৯ জনের এক প্রতিনিধি দল আরটিএ কর্তৃপক্ষের সাথে দেখা করে দাবি সনদ পেশ করে। কর্তৃপক্ষ বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে মোটরভ্যানের গুরুত্ব স্বীকার করে তার বৈধ স্বীকৃতির বিষয়টি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের আশ্বাস দেন। পরে সমবেত ভ্যানশ্রমিকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত সাংগঠনিক সভায় প্রতিটি থানায় বিক্ষোভ ও থানাভিত্তিক সম্মেলন এবং পরবর্তীতে ২৮ জুলাই জেলা সম্মেলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উত্তর ২৪ পরগণা জেলাশাসক দপ্তরে এই অভিযানের সংবাদ পেয়ে পার্শ্ববর্তী নদিয়া জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকেও কিছু প্রতিনিধি কর্মসূচিতে যোগ দেয় এবং ২৭ জুলাই নদিয়া জেলা সম্মেলন এবং নদিয়া জেলাশাসক দপ্তর অভিযানের কর্মসূচি পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই আন্দোলনে উপস্থিত শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে প্রবল উৎসাহ ও আবেগ সঞ্চারিত হয়।

গৃহবধূ হত্যার প্রতিবাদে মহিলা বিক্ষোভ

হাওড়ার বাগনান থানার মতিমালা গ্রামের গৃহবধূ নাসিমা বেগমকে তার স্বামী, শ্বশুর ও পরিবারের অন্যান্যরা মিলে দীর্ঘদিন শারীরিক নির্যাতন করে ২৭ এপ্রিল পুড়িয়ে মারে। পরদিন থানায় এফ আই আর করা হয়। কিন্তু বারবার বলা সত্ত্বেও পুলিশ তার শ্বশুর ছাড়া আর কোন অপরাধীকে আজও গ্রেপ্তার করেনি।

এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং অপরাধীদের শাস্তির দাবিতে এ আই এম এস এস হাওড়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ২৩ জুন থানায় অবস্থান ও ১১ জুলাই ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বাগনান থানার ওসি কয়েকদিনের মধ্যে অপরাধীদের গ্রেপ্তারের প্রতিশ্রুতি দেন। মহিলা নেতৃবৃন্দ জানান, অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হলে আগামীদিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন করা হবে।

কৃষক বাঁচাও সমিতির ডেপুটেশন দিনহাটায়

কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমার পাটচাষীরা চরম বিপদে পড়েছেন। এ বছর তাঁরা মহামায়া কৃষি ভাণ্ডারের শঙ্খমার্কা লাল পাটবীজ বপন করে সর্বস্বান্ত হওয়ার পথে। বীজ মালিক বলেছিলেন — ভালো ফলন হবে। কিন্তু গাছ চারফুট হতে না হতেই ফুল ধরে যায় এবং অসংখ্য ডালপালার জঙ্গল তৈরি হয় যা থেকে পাট হওয়া সম্ভব নয়, উপরন্তু এই জঙ্গল সাফ করার জন্য আরও খরচ বাড়বে। শুধু পাটের ক্ষেত্রেই নয়, ইতিপূর্বে গমের ক্ষেত্রেও এইরূপ বিপর্যয় হয়েছে। এমনিতেই চাষের খরচ দিন দিন বাড়ছে, তার উপর ফলন যদি মাঠেই মারা যায় তাহলে কৃষকের সর্বনাশ। এমতাবস্থায় কৃষকরা বাঁচার পথ খুঁজছেন। তাঁরা প্রতিকারের আশায় সিপিএম, ফরওয়ার্ড ব্লক, তৃণমূল প্রভৃতি দলগুলির কাছে গিয়েছিলেন। কিন্তু কেউ কোনও পথ দেখাতে পারেনি। ফলে ক্ষুব্ধ চাষীরা মহামায়া কৃষিভাণ্ডারের সামনে পথ অবরোধ করেন। অসংগঠিত এই আন্দোলনকে পুলিশ ছত্রখান করে দেয়। কৃষকরা বুঝতে পারেন আন্দোলনের জন্য প্রয়োজন সংগঠন, সংগ্রামী ঐক্য এবং সঠিক দিশা। ফলে তাঁরা 'কৃষক বাঁচাও সমিতি' গঠন করে আন্দোলনে সামিল হন। গত ২৩ জুন দিনহাটা এসডিও অফিসে শত শত কৃষক ডেপুটেশন দিয়ে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, অসাধু ব্যবসায়ীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং তদন্তের দাবি করেন। এসডিও তড়িঘড়ি তদন্তের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্তকারী দল অনুসন্ধান করে কৃষকের ভয়াবহ ক্ষতির কথা স্বীকার করা সত্ত্বেও আজও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়নি। কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেবার ক্ষেত্রে সরকারি অনীহা, অন্যদিকে বৃহৎ বুর্জোয়াদের কোটি কোটি টাকা ট্যাক্স ছাড় দেওয়ার সরকারি নজির দেখিয়ে দেয়, এই সরকার কৃষকদের স্বার্থ আদৌ দেখছে না। কৃষক বাঁচাও সমিতির পক্ষে সম্পাদক সুধাংশু বর্মন ও দীনবন্ধু বর্মন জানিয়েছেন, কৃষকরা বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ইতিমধ্যেই অসাধু ব্যবসায়ীদের নামে থানায় এজাহার করা হয়েছে।

সাপ্তাহিক **গণদাবী**'র
গ্রাহক হোন
গ্রাহক চাঁদা (সডাক)— বার্ষিক ৯১ টাকা
— ষান্মাষিক ৪৬ টাকা
টাকা পাঠাবার ঠিকানা ঃ
৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩

কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি

একের পাতার পর

দেওয়ার জন্যও তিনি সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, জনগণের শত্রুদের দ্বারা এই ধরনের আক্রমণ থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার জন্য কার্যকরী সুরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করার কাজটা সরকারের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।

এই প্রসঙ্গে শিবসেনা সমর্থকদের সমালোচনা করে কমরেড মুখার্জী বলেন, তাদের সুপ্রিমো'র স্ত্রী'র মূর্তিতে কালি লেপনের প্রতিবাদ করার নামে তারা যেভাবে তাণ্ডব চালিয়েছে ও সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টির চেষ্টা করেছে, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

মুম্বইয়ে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণ ও কাশ্মীরের পর্যটকদের উপর কাপুরুষোচিত হামলার পথ ধরে দেশে যাতে কোনরকম সাম্প্রদায়িকতার আগুন না জ্বলে ওঠে, সে বিষয়ে দেশের মানুষকে সজাগ থাকার জন্য আবেদন জানিয়ে কমরেড মুখার্জী বলেছেন, সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর এইসব ঘৃণ্য আক্রমণের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিই একমাত্র যথার্থ প্রতিরোধের দুর্গ হিসাবে কাজ করতে পারে।

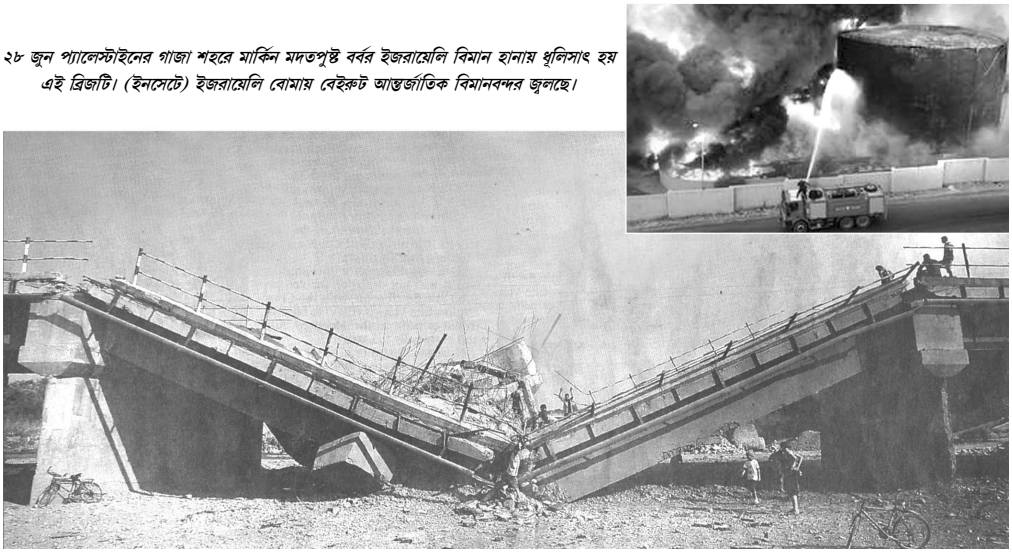

২৮ জুন প্যালেস্টাইনের গাজা শহরে মার্কিন মদতপুষ্ট বর্বর ইজরায়েলি বিমান হানায় ধূলিসাৎ হয় এই ব্রিজটি। (ইনসেটে) ইজরায়েলি বোমায় বেইরুট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর জ্বলছে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩২৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in